শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	ভুল-সংশোধন
৬৪	৭	৫ম শব্দটি মুণীন্দ্র
৭৫	৩	৩য় শব্দটি নিবৃত্ত।
৭৮	১৬	২য় শব্দে 'ং' থাক্‌বেনা।
৮১	১১	৬ম শব্দ কটূক্তি।
৮৩	১১	৪র্থ শব্দ গুরুত্ব।
৯০	১৪	১ম শব্দে 'হ্' থাক্‌বেনা।
১০৮	১৯	'সিংজী'র পরে পূর্ণচ্ছেদ হবে।
১১৬	১১	'হয়েছিলেন'-এর পরে কোনো ছেদ থাকবেনা।

শান্তিনিকেতন আশ্রম

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি
ও
শান্তিনিকেতনের কথা

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

থ্যাকার স্পিঙ্ক
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীমধুসূদন দে
থ্যাকার স্পিঙ্ক
৩নং এসপ্লানেড্ ইষ্ট
কলিকতা-১

এক টাকা
১৩৫৭

মুদ্রাপক—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
কলিকাতা—১৩

ভূমিকা

আমার পিতৃদেব ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনেকিতন আশ্রমের সুরুতে আশ্রমধারী ছিলেন। তিনি এই আশ্রম সম্বন্ধে যা লিখে রেখে গেছেন তা এই পুস্তকে প্রকাশ করা গেলো। "শান্তিনিকেতনের স্মৃতির" প্রথমাংশ, ১ম হতে ৩য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, ১৩৩৫।৩৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বাকী তিন পরিচ্ছেদ এই প্রথম প্রকাশিত হলো।

পিতৃদেব এর অধিক লিপিবদ্ধ করার সময় পান নাই। আগে এ-বিষয়ে লিখ্‌তে চাইতেননা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিদ্যায়তনের জন্যে এ-স্থান বহুবিশ্রুত হওয়ার পরে এর সঙ্গে আপন সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, পাছে কেউ মনে করেন এখানকার গৌরবের কথায় স্থান পাবার চেষ্টা করচেন, কারণ এরূপ যে কেউ না করেন তা নয়। যখন বুঝলেন তিনি না লিখ্‌লে অনেক কথাই অজ্ঞাত থেকে যাবে, এবং অনেক ভ্রমাত্মক কথার প্রচলন হতে পারে, তখন লিখ্‌তে রাজি হলেন। কিন্তু অত্যন্ত দেরিতে তা ঘট্‌লো। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তাঁর কথা শেষ করার সময় পেলেননা। এখান হতে শান্তিনিকেতন

সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি যে যদিচ তিনি রেলপথে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস করতেন, তবু কেউ তাঁর কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

পিতৃদেব তাঁর বিবরণ আশ্রমের ভার গ্রহণ করার সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। আশ্রমের পরিচর্যা করে গেছেন প্রায় সাড়ে নয় বছর, কিন্তু সে-সময়ের কথা বিশেষ কিছু লেখবার সময় পান নাই। তাঁর ডায়ারি, চিঠিপত্র ও আমার নিজের স্মৃতি হতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পূর্বকথা এবং প্রসঙ্গক্রমে আশ্রম-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করলাম। যা'র ভিত্তি নাই এমন কোনো কথা লিখ্‌লামনা।

বর্ত্তমান সময়ের অনেকেই মহর্ষিদেবের আশ্রমের কথা তেমন জানেননা। এখানকার বিদ্যায়তন যে-সাধনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন পূর্বেও ছিল, এখন নানাকারণে অধিক হয়েছে। অনটনের দিনে এই পুস্তক প্রকাশ করলাম এই আশায় যে এর পাঠকেরা আশ্রম ও এখানকার বিবিধ প্রচেষ্টার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হবেন।

শান্তিনিকেতন,
৩রা মাঘ, ১৩৫৬ সাল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—১২৬৮ সাল, ৩রা মাঘ।

মৃত্যু—১৩৩৯ সাল, ১৬ই মাঘ।

শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শনের কাজ—
১২৯৪ সাল, ফাল্গুন।

আশ্রমধারীরূপে কার্যভার গ্রহণ—১২৯৫ সাল, কার্তিক।

অবসর গ্রহণ—১৩০৪ সাল, আষাঢ়।

পুস্তক রচনা—(১) ভক্তচরিতামৃত, (২) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত, (৩) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (৪) মেয়েলি ব্রত, (৫) শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত (৬) চিন্তাবিন্দু, (৭) বালকবন্ধু।

সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ রচনা—

পত্রগুলির নাম—(সাপ্তাহিক) (১) এডুকেশন গেজেট্, (২) ভারতমিহির, (৩) চারুবার্ত্তা, (৪) সুধাকর, (৫) সঞ্জীবনী, (৬) সোম-প্রকাশ, (৭) হিতবাদী, (৮) নবযুগ, (৯) সময়।

(পাক্ষিক) (১০) তত্ত্বকৌমুদী, (১১) অনুসন্ধান।

(মাসিক) (১২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (১৩) ধর্ম্ম-বন্ধু, (১৪) জ্যোতিঃ (কিছুদিন সম্পাদকতা), (১৫) সাধনা, (১৬) ভারতী, (১৭) প্রদীপ, (১৮) দাসী, (১৯) প্রবাসী, (২০) সৎসঙ্গ, (২১) সজ্জন-তোষণী।

এ-ভিন্ন আরো অনেক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শান্তিনিকেতন ও কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর নাম এক্ষণে বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পূর্ব্ববিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বকথা ও আমার জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৭৭৮ শকে (১২৬৩ সাল) শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংসারে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নির্জ্জনবাসে কঠোর তপঃসাধনের জন্য হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। পরে অকস্মাৎ একদিন একটি পার্ব্বত্যনদীর গতিবেগ দর্শনে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র। ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবলবেগে ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা!

সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্য্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিলাম—'তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর'। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল, মনে হইল আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম।"

রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রিতে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, বুক জোরে ধড়ফড় করিতে লাগিল। সঙ্গের অনুচরকে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন।

এই কথা বলিতে বলিতে হৃদ্‌কম্প কমিয়া গেল—তিনি আরাম লাভ করিলেন। "ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া" ইহাই ধারণা হইল। এই সময় সিপাহীবিদ্রোহের বিভীষিকায় দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। অনেক বিঘ্ন-সঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ ৪১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পরেই মহর্ষির পারিবারিক ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু শান্তরসাস্পদ নির্জ্জন প্রদেশে পরমাত্মার স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণায় ও দেশ-ভ্রমণেই তিনি প্রাণের যথার্থ আরাম লাভ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই তিনি সময়ে সময়ে কর্ম্মকোলাহল হইতে উপরত হইয়া কখন স্থলপথে, কখন জলপথে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, কাশ্মীর, দার্জ্জিলিং ও হিমালয় প্রদেশের নানা স্থানে অল্পসংখ্যক পরিচারক মাত্র সঙ্গে লইয়া একপ্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিতেছেন। এক সময়ে তিনি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গুস্‌করা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে তাম্বুতে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় এই স্থলে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে বীরভূম জেলার বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী রায়পুরের জমিদার বাবু ভুবনমোহন সিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থজাতীয় এই সিংহ মহাশয়দের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অমায়িকস্বভাব বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ* ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং "প্রেম" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুপণ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ভায়া প্রতাপনারায়ণ বাবুর তৃতীয় পুত্র। হেমেন্দ্রবাবু ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরি এই দুইটি দেশীয় রাজ্যের শাসনকার্য্যে ন্যায়পরতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে যথেষ্ঠ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লর্ড এস্, পি, সিংহ মহোদয় রায়পুর সিংহ বংশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার নামযোগে রায়পুর গ্রাম এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বীরভূম জেলার ভিতরে এই গ্রামকেই আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আদিস্থান বলা যাইতে পারে।

* কি ঘটনাসূত্রে এবং কোন সময়ে কোথায় এই পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহর্ষিদেবের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। মহর্ষিদেব ১৭৭৮ শকের (১২৬৩ সালের) ১২ই আশ্বিন নির্জ্জন তপস্যার জন্য হিমালয় প্রদেশে গমন করেন এবং ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি ১৭৮০ শকের ১২ই শ্রাবণ শিমলা হইতে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহার এক স্থানে লিখিতেছেন, "তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূমনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত

বোলপুর রেলষ্টেশনের উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মৃত্তিকা কঙ্কর ও বালুকামিশ্রিত বলিয়া সাধারণতঃ এই স্থানে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। ষ্টেশনের সমতল ভূমি হইতে এই ডাঙ্গাভূমি অনেক উচ্চ, এজন্য এই ডাঙ্গা ভেদ করিয়া রেললাইন প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা রেলে যাতায়াত করেন, এই প্রান্তর বা উচ্চ ডাঙ্গাভূমি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। ষ্টেশন হইতে প্রায় একক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কয়েক ঘর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান প্রজা বসাইয়া ভুবনবাবু একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের পত্তন করেন। ভুবনবাবুর স্থাপিত বলিয়া গ্রামখানি ভুবনডাঙ্গা নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্ষার সময় বৃষ্টির জলে ডাঙ্গার কোন কোন স্থান ক্ষয় হইয়া গভীর খাদে পরিণত হয়। ভুবন-ডাঙ্গার উত্তর ও পশ্চিম অংশে এইরূপ একটি বড় খাদ ছিল। এই খাদের পশ্চিম দিকের ভূমি ক্রমশঃ নিম্ন। খাদের মাটী খনন করিয়া এই নিম্ন ভূমির উপরে উত্তর-

হইয়াছেন।” আমরা শুনিয়াছি প্রতাপবাবু মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি প্রতাপবাবুর মুখে মহর্ষিদেবকে গুরুজি বলিয়া উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। প্রতাপবাবুর লিখিত পত্র আমার নিকট আছে তাহাতে ‘মহর্ষি গুরুদেব’ ও ‘গুরুজি’ এইরূপ উল্লেখ আছে। ইহাঁদের সহিত মহর্ষিদেবের পরিচয় যে ১৭৮০ শক, অর্থাৎ ১২৬৫ সালের, অনেক পূর্ব্বের ঘটনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দক্ষিণে লম্বা একটি উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের ও নিম্নের কৃষিভূমি সেচনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এদেশে এই জলাশয়কে বাঁধ বলে। ইহা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা বলিয়া মনে হয়।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, সম্ভবতঃ সন ১২৬৮ সালে, মহর্ষিদেব ভুবনবাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার রায়পুরের বাটীতে আগমন করেন। ১৮৬৮ সালের ১৮ই চৈত্র তারিখে মহর্ষিদেব ভুবনবাবুর বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনায় তিনি যে বক্তৃতা দেন ও সঙ্গীত হয় তাহা একখণ্ড পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

"বীরভূমের রায়পুর নিবাসী বিখ্যাত গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়ের গৃহে ১৭৮৩ শকের চৈত্র মাসের অষ্টাদশ দিবসে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তাহাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় যে ব্যাখ্যা করেন এবং যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয় তাহা প্রকাশিত হইল।"

ভুবনবাবুর বাটীতে ইহাই যে মহর্ষির প্রথম উপাসনা তাহা নহে। তিনি এই উপাসনার উদ্বোধনের প্রথমেই বলিতেছেন, "আমরা পুনর্ব্বার এখানে উপাসনার নিমিত্তে সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। কেমন তাঁহার করুণা,

আমরা এক মাস পূর্ব্বে এখানে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে পূজোপহার প্রদান করিয়াছি, আবার অদ্য স্নেহময় পিতার নাম এখানে প্রতিধ্বনিত হইবে।" সুতরাং এই বৎসরের ফাল্গুন মাসে মহর্ষিদেব রায়পুরে আসিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। নিশ্চিতরূপে তারিখ অবধারণ করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় * এই দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগ্বলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয়মন প্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জ্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

* মহর্ষিদেব কোন্ সুযোগে এবং কখন এ-স্থানটি আবিষ্কার করলেন সে-সম্বন্ধে অনেক প্রকারের কথা প্রচারিত হয়েছে। তিনি আহম্মদপুর রেল ষ্টেশন হতে পালকিতে বোলপুরে আসছিলেন এবং তখন এই স্থান দেখে পছন্দ করেন, এরূপ কথা বলা হয়েছে। তিনি কখন কী কারণে এপথে পালকিতে আসছিলেন সে-কথা কেউ বলেন না। এ-কথার ভিত্তি কী তাও জানা যায় না। রেলপথ হওয়ার পর তিনি কেন আহম্মদপুর হতে বোলপুর পালকিতে আসবেন? তখনকার দিনে এ-সকল অঞ্চলে গরুর গাড়ী এবং পাল্‌কি ভিন্ন আর কোনো বাহন ছিলনা। মহর্ষিদেব এ-স্থান লওয়ার আগে অবশ্যই পালকিতে ঘুরে দেখেছেন ও পরে পছন্দ করেছেন বলে মনে হয়। এই হতে পালকির কথা ওঠা বিচিত্র নয়। মহর্ষিদেবের জীবনচরিতকার অজিতবাবু লিখেছেন, তিনি বোলপুর হতে রায়পুরের পথে এ-স্থান দেখেন। জায়গাটি সে-দিকেই

পূর্ব্ববর্ণিত বাঁধ বা জলাশয়ের অনতিদূরে দুইটি সপ্তপর্ণী (ছাতিম) বৃক্ষ ছিল। এই স্থানটির পশ্চিমভাগ বহুদূর

নয়, ঠিক উল্টো দিকে। গুরুদেবের জীবনচরিত-লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, মহর্ষিদেব রায়পুরে যাচ্ছিলেন সুরুলের পথে। কেন ঘুর পথে যাচ্ছিলেন তা বলেন নাই। আর তা হলেও বাঁধগোড়ার রাস্তা থেকে এ-স্থান কতটুকু দেখা যায় তাও বিবেচনার বিষয়। ভুবনবাবুর নিমন্ত্রণে মহর্ষিদেব ১২৬৮ সালে মাসখানেকের ব্যবধানে দু'বার রায়পুরে আসেন এবং পরের বছর শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা নেন। পাট্টার তারিখ ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৯ সাল। এই তথ্যগুলির উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে ভুবনবাবু এ-স্থানটি তাঁকে দেখান। পূর্ব্বেই বলেছি সে-সময়ে মহর্ষিদেবের পালকিতে ঘোরাফেরা করাই সম্ভব। পাট্টা লওয়া হয়েছিল মহর্ষিদেবের রায়পুরে আসার এক বছর পরে ভুবনবাবুর পুত্রদের কাছ থেকে। সুতরাং তাঁর আগমন ও পাট্টা লওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভুবনবাবু পরলোকগমন করেছিলেন এরূপ অনুমান করতে হয়।

ভুবনডাঙ্গা গ্রামটি (শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্টডীডে ভুবননগর নাম পাওয়া যায়: জায়গাটি একটি 'ডাঙ্গা', সেইজন্যেই মনে হয় ভুবননগর 'ভুবনডাঙ্গায়' দাঁড়িয়েছে) এই ভুবনবাবু স্থাপন করেন এ-অঞ্চলে এরূপ প্রচার আছে। পিতৃদেব বরাবর তাই শুনেছিলেন। এই সূত্রে এখন আর এক ভুবনমোহনের নাম শোনা গেছে। রায়পুরের ঘোষালেরা সিংহ পরিবারের পুরোহিত বংশের লোক। এ-স্থান তাঁরা বলেন, তাঁদের ব্রহ্মত্র ছিল, কিন্তু পরে মকর্দমায় তা হারিয়েছেন। এই পরিবারে এ-কথা প্রচলিত আছে যে তাঁদেরই এক পূর্ব্বপুরুষ 'ভুবনমোহন' গ্রামখানি বসিয়েছিলেন। তা হলেও এটা আশ্রমের জমির পাট্টা লওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা।

রায়পুরে আসার আগে মহর্ষিদেব গুস্‌করায় তাঁবুতে বাস করে গিয়েছিলেন। তিনি নির্জ্জন স্থান খুঁজছিলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে তিনি দু'বার রায়পুরে আগমন করেন, এবং তার পরে এ জায়গার পাট্টা লওয়া হয়। এই সকল তথ্য একত্র করে দেখা যেতে পারে। অঃ চঃ।

প্রসারিত বলিয়া মহর্ষিদেব প্রান্তরের এই অংশে তাম্বু স্থাপন করিয়া নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রদেশে তপঃসাধনে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই প্রান্তরে তাঁহার মন বসিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে এই স্থানে তাঁহার তাম্বু পড়িতে লাগিল। কিছুদিন পরে এখানে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া সন ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ভুবনবাবুর পুত্রদের নিকট কুড়ি বিঘা ভূমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনা ধার্য্য করিয়া মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে এই জনশূন্য প্রান্তরে বহু অর্থব্যয়ে বাসোপযোগী প্রথমে একতালা পরে দোতালা পাকা ইরামত প্রস্তুত হইল, প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণ আসবাবাদি সংগৃহীত হইল, আম জাম নারিকেল কাঁঠাল আমলকী শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ ফলবান ও ছায়াতরুসকল রোপিত হইল, নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে প্রস্ফুটিত মালতী ও মাধবীর লতাবিতানে কঙ্করময় ঊষরভূমি পরমশোভাময় হইয়া উঠিল। মহর্ষি এই পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকার নাম দিলেন "শান্তিনিকেতন"।

এই অনুর্ব্বর প্রান্তরে উদ্যান প্রস্তুত করা বহু আয়াস ও অর্থ-সাধ্য ব্যাপার। ডাঙ্গার কঙ্করমিশ্রিত মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্যত্র হইতে উৎকৃষ্ট মাটী আনিয়া ঐ সকল স্থান

পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। জলাশয় ব্যতীত উদ্যানের শোভা হয় না, এ নিমিত্ত একটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী খনন করিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। খনিত কঙ্করময় মৃত্তিকা স্তূপীকৃত হইয়া ছোট পাহাড়ের আকারে পরিণত হইল, তথাপি এই উচ্চ ডাঙ্গায় জল উঠিল না। অগত্যা পুষ্করিণীর আশা পরিত্যাগ করিয়া জলের জন্য ভুবনডাঙ্গার পূর্ব্বোক্ত বাঁধ ও সুগভীর ইন্দরার উপরেই নির্ভর করিতে হইল। এই উদ্যানের চারিদিকের সীমানায় শাল সেগুন মহুয়া কেন্দ্ (আবলুশ) প্রভৃতি তরুশ্রেণী রোপণ করা হয়, কিন্তু বেড়া দিয়া গণ্ডীবদ্ধ করা হয় নাই। "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" যেমন সকলের অধিগম্য, এই শান্তিনিকেতনও সেইরূপ সকল মানবের অধিগম্য, গণ্ডীবদ্ধ না হওয়ায় মহর্ষিদেবের হৃদয়ের এই উদার ভাবই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ নানাশ্রেণীর তরুরাজি উন্নতশীর্ষ ও শাখা-প্রশাখায় পরিশোভিত হইলে নানাজাতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত-নিনাদে আশ্রয়-কানন নিনাদিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে দুইটী সপ্তচ্ছদ বা ছাতিম বৃক্ষের কথা বলা হইয়াছে, উহারই একটির পাদমূলে ছায়াতলে শান্ত-সমাহিত-চিত্তে "আনন্দরূপমমৃতং" ব্রহ্মের উপাসনার জন্য মহর্ষি শ্বেত-প্রস্তরের একটি বেদী নির্ম্মাণ করিলেন, এই উদ্যানবাটী

সাধনাশ্রমে পরিণত হইল। মহর্ষিদেবের মুখে শুনিয়াছি, বেদীপ্রস্তুতের জন্য এই স্থান খনন করিবার সময় অনেক নরমুণ্ডাস্থি (skull) পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসিগণকে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করিতে এই বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয়। এক্ষণে স্থানে স্থানে সাঁওতাল প্রভৃতির বসতি হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে সুবিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিত, জনমানবের সাড়া-শব্দ ছিল না। দস্যুগণ এই মাঠে রাহাজানি করিত, দুই চারিটি পয়সা বা একখানি বস্ত্রের লোভে নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার নানাস্থানে এইরূপ অত্যাচার সঙ্ঘটিত হইত। এই নরঘাতক দস্যুগণকে লোকে "মানস্যুরে" ও "ফাঁসিয়ারা" বলিত; রাজশাসনে এক্ষণে ইহাদের উপদ্রব প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।

মহর্ষির অবস্থিতিকালে শান্তিনিকতনে একবার ডাকাতি হয়। এজন্য তিনি দস্যুদলের অবস্থাভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত দারোয়ান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। শুনিয়াছি মানকরের জমিদার বাবু হিতলাল মিশ্র একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে মহর্ষির নিকটে পাঠাইয়া দেন। ইহার নাম দ্বারিক সর্দ্দার। দ্বারিক সর্দ্দার এই কর্ম্মসূত্রে মানকর হইতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাসস্থাপন করিয়াছিল। বার্দ্ধক্য

অবস্থাতেও এই ব্যক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্রেরা ভুবনডাঙ্গায় বাস করিতেছে। প্রায় ঊনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১২৯৫ সালে, আমি যখন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলাম, তখন দ্বারিক সর্দ্দার আশ্রমের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। তাহার বিশ্বস্ততায় নির্ভর করিয়া আমরা নির্ভয়ে বাস করিতাম। এই সময়ে একবার আশ্রমের উত্তর দিকের মাঠে রাহাজানির উপক্রম ঘটিয়াছিল। যথাস্থানে ইহার বিবরণ উল্লিখিত হইবে।

বাবু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক জীবনবৃত্তগ্রন্থের ৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙ্গা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। * * পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারিদিকে জনশূন্য। ডাকাতির পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর হইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছের তলায় তাহাদের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দ্দার ধরা দিল, ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল।"

তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে * আমি বোলপুরে বাস করিতাম, ভুবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীতে ডাকাইতদলের বাস ছিল শুনি নাই। গ্রামও বেশীদিনের নহে, নামেই তাহার পরিচয়। প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুর্বৃত্ত লোকে পথিকদিগের প্রতি দস্যুতা করিত, ইহাই সম্ভবপর। জনশূন্য মাঠে ডাকাতি হয় না, রাহাজানি হয়। আর দ্বারিক সর্দ্দার "ডাকাতের দলের সর্দ্দার" রূপে ধরা দেয় নাই, চাকরী করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। সুতরাং অজিতবাবুর উক্তি ভ্রমাত্মক।†

কলিকাতা হইতে বোলপুরের দূরত্ব ৯৯ মাইল মাত্র। রেলযোগে অল্পসময়েই যাতায়াতের সুবিধা। এখন হইতে মহর্ষিদেব মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রেরাও কেহ কেহ অনেক সময় এখানে তাঁহার কাছে থাকিতেন। মহর্ষির অন্তরঙ্গ সখা রায়পুর-নিবাসী বাবু শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের নাম উল্লেখ

* পিতৃদেব ১২৯০ সালে বোলপুর আসেন। জ্ঞঃ চঃ।

† অনুসন্ধানে জানা যায় যে দ্বারিক সর্দ্দার পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের লোক ছিল। মানকরের জমিদার বাড়ীতে সর্দ্দার কাজ করতো। কয়েকবার সর্দ্দার আমাকে বর্দ্ধমান জেলায় আমাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে বর্দ্ধমান সহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী দেখেছি। এ-পরিবারের কেউ ডাকাত ছিল এরূপ শোনা যায় না।—জ্ঞঃ চঃ।

না করিলে মহর্ষির শান্তিনিকেতন-প্রবাসের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহর্ষি ইঁহাকে শান্তিনিকেতনের "বুলবুল" বলিতেন। ইঁহার বিষয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। "ইনি পারস্য ভাষাভিজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, আর বিশেষরূপে সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার প্রেম ও ভাব-বিহ্বলতা ইহাঁকে আমৃত্যু সুরসাল করিয়া রাখিয়াছিল। ইনি বহু সময় শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহবাসে থাকিয়া সেই নির্জ্জন শান্ত শান্তিনিকেতনকে ঝঙ্কারিত করিয়া রাখিতেন"।* ইনি লর্ড এস, পি, সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

মহর্ষির প্রব্রজ্যানুরাগ অসাধারণ। বিপুল অর্থব্যয়ে প্রস্তুত এত সাধের শান্তিনিকেতন পড়িয়া রহিল। নদনদী সমুদ্র পর্ব্বতের নব নব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সৌন্দর্য্যঘন পরমাত্মায় চিত্ত সমাধান করিবার জন্য আবার ছুটিলেন। তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি কখন শান্তিনিকেতনে, কখন শিমলা শৈলে, কখন

* পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী," ২১৭ পৃষ্ঠা।

অমৃতসরে, কখন বক্রোটাশেখরে, কখন মসূরী পর্ব্বতে, কখন কাশ্মীরে বাস করিতেছেন, আবার কখন বা তাঁহার জমিদারী শিলাইদহ, সাহাজাদপুর, কালীগ্রাম ও কলিকাতার বাটীতে আসিয়া বিষয়-ব্যাপার ও ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার চীন, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের কথা অনেকেই অবগত আছেন। সন ১২৯০ সালের বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি পাটনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মসূরী পর্ব্বতে গমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং শোকাচ্ছন্ন পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কলিকাতা গমনের উদ্দেশে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে কলিকাতা গিয়া "বাড়ীতে তিনদিন মাত্র থাকিলেন। অনন্তর বজরাযোগে পদ্মাবক্ষে বেড়াইতে বাহির হইলেন।"* ইহার পর মহর্ষি আর কখনও শান্তি-নিকেতনে আগমন করেন নাই।

(২)

সন ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যবসায় উপলক্ষে আমি বোলপুরে আগমন করি। এই সময় আমার বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন বাইশ বৎসর মাত্র। এখানে আসিবার পূর্ব্বে

* মহর্ষিদেবের আত্মচরিতের পরিশিষ্ট, ৩৭ পৃষ্ঠা।

পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতনের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। বোলপুরে থাকিলে শান্তিনিকেতনে মধ্যে মধ্যে যাইতে পারিব এবং কোনও সময়ে মহর্ষিদেবের দর্শন লাভও ঘটিতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে প্রবল ছিল। এখানে আসিবার কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনে গেলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রাসাদ মেরামতের অভাবে শ্রীভ্রষ্ট, আসবাব-পত্রও যৎসামান্য, উদ্যানের বৃক্ষলতাদি যত্নের অভাবে অধিকাংশই শুষ্ক ও শ্রীহীন এবং আশ্রম প্রাঙ্গণ শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও আবর্জ্জনাতে পরিপূর্ণ। কেবল শাল, সেগুন, বকুল, আমলকী প্রভৃতি তরুশ্রেণী বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। আশ্রমে দুই-তিনজন মালী মাত্র অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা বলিল, কর্ত্তামহাশয় বহু দিন এখানে আসেন নাই। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষতলে বেদিকা দেখাইয়া ভৃত্যেরা বলিল, এইস্থানে কর্ত্তামহাশয় উপাসনা করিতেন। বেদীর নিম্নে কঙ্করবিস্তৃত ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ইহার পর বিষয়-কর্ম্মের অবসর সময়ে কখন একাকী, কখন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিতাম। এই নির্জ্জন আশ্রমের মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের প্রাণমন স্বতঃই ভগবচ্চরণে সমাহিত হইত। কিন্তু আশ্রমের

বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। মনে হইত, মহর্ষি আর যদি এই আশ্রমে না আসেন—তাঁহার বয়স হইয়াছে—পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই পবিত্র স্থান কি ভাবে ব্যবহার করিবেন? আবার কখন কখন শুনিতাম এই আশ্রমউদ্যান বিক্রয় করা হইবে। মহর্ষির পবিত্র সাধনাশ্রম হয়ত কোন ধনবান বিলাসীর প্রমোদকাননে পরিণত হইবে,—এইরূপ চিন্তায় প্রাণে অতিশয় ক্লেশানুভব করিতাম।

সন ১২৯০ সালে, প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে, * বোলপুরের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। এখনকার ন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার, বহুসংখ্যক কলকারখানা ও নানা শ্রেণীর লোক-সংঘট্ট তখন কিছুই ছিল না। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। একটি মুনসেফী আদালত, তাহাতে আট নয় জন মাত্র উকিল, তাহার মধ্যে দুইজন মাত্র ইংরাজিনবিশ। প্রায় এক মাইল দূরে বাঁধগোড়া পল্লীতে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়; কোন বৎসর দুই একটি ছাত্র পাশ হইত, কোন বৎসর হইত না। সাধারণের নৈতিক অবস্থাও উন্নত ছিল না। ব্যভিচার ও মদ্যপান অনেকে নিন্দার বিষয় মনে

* এই নিবন্ধ ১৩৩৬ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। জঃ চঃ।

করিতেন না। আমি এখানে আসিবার কিছুদিন পরে চুঁচুড়া ধর্ম্মপুর নিবাসী বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার ও বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় সেকেণ্ড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। একদিন নবীনবাবুর বাসায় গিয়া দেখিলাম তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। ক্রমে ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও আত্মীয়তা ঘনীভূত হইতে লাগিল। অবকাশকালে আমরা তিনজনে একত্র হইয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ ও জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। ইহার পর প্রতি সপ্তাহে একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য শশীবাবুর বাসায় "বোলপুর-প্রার্থনা-সমাজ" স্থাপিত হইল।

এই সময় কাশী ধর্ম্মসভার কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও তদীয় সহযোগী পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির আধ্যাত্মিক শাস্ত্রব্যাখ্যায় বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। নানাস্থানে বহু আড়ম্বরে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোলপুরেও এইরূপ "হরিসভা" সংস্থাপিত হইল। তৎকালে সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসনার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হরিসভার প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু বোলপুরে অন্যরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল। বাবু

সারদাপ্রসাদ পাল বোলপুরের জনৈক ধর্ম্মাত্মা ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী। তিনি কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, স্বীয় পুত্রের নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন * রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি বোলপুরের হরিসভায় যোগ দিলেন না। তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও চরিত্রগুণে আমরা তাঁহাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করিতাম, সেই শ্রদ্ধা বন্ধুতায় পরিণত হইল। তিনি উদ্যোগী হইয়া বোলপুর বারোয়ারীতলার গৃহে সাধারণভাবে ধর্ম্মালোচনার জন্য "ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিলেন। প্রতি সপ্তাহে এই সভার অধিবেশন হইত। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিতে লাগিলাম। সে সময়ে এখনকার ন্যায় গীতা গ্রন্থের ভূরি প্রচার ছিল না, অনেকে এই গ্রন্থ চক্ষেও দেখেন নাই। মানকরের জমিদার বাবু হিতলাল মিশ্রের অর্থানুকূল্যে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসভার জন্য ঐ গ্রন্থ কলিকাতার সংস্কৃত

* আমার বন্ধু এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল বোলপুরেই আছেন। তাঁর পুত্র বোলপুর হাইস্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক। জঃ চঃ (১৩৫৬)।

প্রেস ডিপজিটারী নামক পুস্তকালয় হইতে একখানি সাত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

আমার বোলপুর আগমনের কয়েক মাস পরে একদিন শুনিলাম, মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। অপরাহ্ণ তিনটার ট্রেণে কলিকাতা গমন করিবেন। এই সংবাদে তাঁহার দর্শন লালসায় ষ্টেশনে ছুটিলাম। দেখিলাম ডাউন প্লাটফর্ম্মে একখানি চেয়ারে মহর্ষি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও পরিচরগণ তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে উঠাইয়া দিলেন। শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত প্রশান্ত গম্ভীর সৌম্য ঋষিমূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থ হইলাম। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম এবং তাঁহার মুখের দুই একটি কথাও শুনিলাম, ইহাতেই আমি জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। ইহার পর মহর্ষিদেব আর কখনও শান্তিনিকেতনে আসেন নাই। একথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩)

বোলপুর "হরিসভার" অধিবেশন কালিকাপুর পটীর বারোয়ারীতলার গৃহে হইত। এখানে প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত।

"ধর্ম্মসভায়" আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতা-পাঠ ও রামায়ণ মহাভারত হইতে আলোচনা করিতাম। অন্যত্র হইতে কোন ধর্ম্মপ্রবক্তা আগমন করিলে তাঁহারাও এই ধর্ম্মসভার গৃহে বক্তৃতা করিতেন। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু শশীভূষণ বসু, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, নববিধান সমাজের বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এইস্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ১৮০৬ শকের (১২৯১ সালের) ১লা কার্ত্তিকের "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকার ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে এস্থানে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা ছিল না, বিগত চৈত্র মাসে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক এখানে আসেন, তারপর হইতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এখন, দুইটি হিন্দুধর্ম্মসভা ও একটি প্রার্থনা-সমাজ সংস্থাপিত হইয়া প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর নিয়মিতরূপে উপাসনা হইতেছে। সমাজগৃহ না থাকায় সম্পাদক মহাশয়ের বাসাতেই উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

ক্রমে আমাদের প্রার্থনা-সমাজের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। এই উৎসবের সময় আমরা শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন নির্জ্জন উপাসনাদিতে যাপন করিয়া যথেষ্ট

আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমরা নগণ্য ব্যক্তি, মহর্ষিদেব বা ঠাকুরবাবুদিগের কাহারও সহিত আমাদের কোনপ্রকার পরিচয় নাই। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছে, এই সংবাদে মহর্ষিদেব অবশ্য সন্তোষলাভ করিবেন, এই বিশ্বাসে আমরা কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া উৎসবের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিলাম। আশ্রমের ভৃত্যেরা বিশেষ যত্নসহকারে আমাদের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। ১৮০৬ শকের ১লা অগ্রহায়ণের "তত্ত্বকৌমুদীতে" এই উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। যথা—"১৭ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে উপাসকদিগের নির্জ্জন উপাসনা, তৎপর সঙ্গীত ও প্রার্থনা। * * * ১৯শে কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে শান্তিনিকেতনে উপাসনা হয়। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। * * * বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় উৎসবের পূর্ব্বে এখানকার ধর্ম্মসভাতে 'মুক্তি কি রূপে লাভ করা যায়' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, ও তৎপর দিন শান্তিনিকেতনে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত উপাসনা করেন।"—তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৬ শক, ১লা অগ্রহায়ণ ১৭৯ পৃষ্ঠা। ইহার পর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে সম্পন্ন হয়।

এবারেও আমরা শান্তিনিকেতনে উৎসব করিয়াছিলাম। "নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বোলপুর প্রার্থনা-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্তঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৯শে শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতনে" উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন।" *

মহর্ষিদেব ১২৯০ সালে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা গিয়া জলপথে ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। পরে পৌষ মাসে চুঁচূড়ায় মাধব দত্তের বাটীতে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বোম্বাই হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার চুঁচূড়ার ঐ বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন। এ পর্য্যন্ত মহর্ষিদেবের সহিত আমার সাক্ষাতের কোন সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে ভগবৎকৃপায় অভাবনীয়রূপে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার বোলপুর আগমনের কিছুদিন পরে বাঁধগোড়া ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার নবীন বাবু ও দ্বিতীয় শিক্ষক শশীবাবুর সহিত আমার বিশিষ্টরূপ

* "তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৮ শক (১২৯৩ সাল) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠা।

আত্মীয়তা সংঘটিত হয়। দুই বৎসর পরে শশীবাবু কর্ম্মসূত্রে অন্যত্র গমন করেন। এক্ষণে উভয়েই পরলোকে। বোলপুরের তদানীন্তন ইংরাজি-অভিজ্ঞ প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় ও ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। আমার শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি-প্রসঙ্গে ইহাঁর বিষয় আরও বিবৃত হইবে। এই সময় বোলপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন বিদ্যার্থী যুবকের সঙ্গে আমি প্রীতি ভালবাসাতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইঁহারা সকলে সমান বয়সের ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রামনাথ সামন্ত, বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও তদীয় অনুজ অনুকূলচন্দ্র রায়, বাবু তিনকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ মুখোপাধ্যায় ও রাইপুরের বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রভৃতির সদ্ভাব, আত্মীয়তা ও স্নেহমমতার সুখময় স্মৃতি আমার হৃদয়ে অতি উজ্জ্বলভাবে জাগরূক রহিয়াছে। রাখালবাবুর নিবাস সিউড়ীর সন্নিহিত মল্লিকপুর গ্রামে। তিনি কলেজের সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বোলপুরে আসিতেন। এই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় বোলপুরে আমার নিকট দুয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী

যাইতেন। আমি কলিকাতা গিয়া ইঁহাদের ছাত্রাবাসেই অবস্থান করিতাম। এই সকল যুবকদের মধুময় সঙ্গ ও সাহচর্য্য দ্বারা আমি জীবনে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলাম। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেই নানা সংপ্রসঙ্গ ও সাহিত্য-চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত হইত। জীবনের উদ্দেশ্য কি, চরিত্রগঠনের উপায়, কি প্রকারে পাপ-প্রলোভন জয় করা যায়, প্রকৃত শান্তিলাভের উপায় কি—এইরূপ গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের আলেচনায় আমরা উপকৃত হইতাম। পরবর্ত্তীকালে ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত, কৃতী ও পদস্থ হইয়া সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক্ষণে রামনাথবাবু, দেবরাজবাবু ও রাখালবাবু মাত্র জীবিত আছেন। * ব্রজেন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবু প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অনুকূলবাবু ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দেবরাজবাবু সিউড়ীর উকিল। রামনাথবাবু সিউড়ীতে মোক্তারী করিতেছেন। ইঁহাদের পুত্রেরাও সুশিক্ষিত আইন-ব্যবসায়ী। রাখালবাবু চাইবাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও মহানুভব ব্যক্তি। তিনি বীরভূম জেলার হেডকোয়াটার সিউড়ী

* রামনাথবাবু ১৩৫২ সালে পরলোকগমন করেছেন, দেবরাজবাবু তারও আগে। রাখালবাবুও আর জীবিত নাই। জঃ চঃ।

সহরে তাঁহার পিতার নামে "বেণীমাধব ইনষ্টিটিউশন্" নামক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে উক্ত স্কুলের জন্য প্রকাণ্ড সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামনাথ সামন্তের নিবাস বোলপুরের নিকটবর্ত্তী মোহনপুর গ্রামে। তাঁহার খুল্লতাত বাবু সীতানাথ সামন্ত উকিলের বাসায় থাকিয়া তিনি বোলপুর স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, এইজন্য তাঁহার সহিত অধিক পরিমাণে আমার মেলা-মিশার সুবিধা ঘটিয়াছিল। আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মমতা ও গভীর শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ১২৯২ সালের শেষে রামনাথ-বাবু বিষয় কর্ম্মের উপলক্ষে কানপুর গমন করেন। কানপুর হইতে তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। এই সকল পত্র তাঁহার হৃদয়ের মহৎভাবে পরিপূর্ণ। ১২৯৩ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কানপুর হইতে তাঁহার যে পত্র পাই, তাহার কিয়দংশ আমার ডায়ারীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। * কানপুর হইতে আজ রামনাথের পত্র পাইয়াছি। রামনাথ পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, 'যদি সেই সত্যস্বরূপ দয়াময়ের প্রতি একান্ত ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শত সহস্র অত্যাচার মস্তকের উপর দিয়া

এমনভাবে যাইবে যে আপনি তাহা অত্যাচার বলিয়া জানিতে পারিবেন না'।” ইহার পর রামনাথবাবু শ্রাবণ মাসে বোলপুরে আসেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদ গমন করেন। এলাহাবাদের প্রচারক ও মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদক শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজীর সহিত রামনাথবাবুর পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। পরে তিনি মহর্ষিদেবকে পত্র লিখিয়া, মহর্ষিদেবের নিকট রামনাথবাবুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই বৎসর (১২৯৩) মাঘোৎসবের পরে মহর্ষিদেব সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হয়েন। চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবৎকৃপায় মহর্ষিদেব এ যাত্রা রক্ষা পান। আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি কলিকাতার চৌরঙ্গীতে কিছুদিন বাস করেন। কলিকাতার বদ্ধ বায়ু সহ্য না হওয়ায় অতঃপর তিনি দার্জ্জিলিং গমন করেন। তথাকার জলকণাসিক্ত শীতল বায়ু তাঁহার দুর্ব্বল দেহে সহ্য না হওয়ায় তিন মাস পরে পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া ৩নং মিড্‌ল্‌টন রো'তে একটি নির্জ্জন বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে থাকেন।

রামনাথবাবু এই সময়ে, অর্থাৎ মহর্ষিদেবের নিকট অবস্থানকালে, প্রসঙ্গত আমার কথা—বোলপুর-প্রার্থনা-

সমাজের কথা—শান্তিনিকেতনে আমাদের উৎসব উপাসনার কথা—এবং শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান দুরবস্থায় আমার ক্লেশানুভবের কথা মহর্ষিকে নিবেদন করেন। আমি তাঁহার একান্ত দর্শনাভিলাষী একথাও তাঁহাকে বলেন। ১২৯৪ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৭ খৃ অঃ) রামানাথবাবুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পোষ্টকার্ডখানি পাইয়াছিলাম। "প্রণামা নিবেদন মিদং—আঙ্গুলের বেদনা ভাল হইয়াছে তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনি ১লা কি ২রা অতি অবশ্য আসিবেন। মহর্ষি মহাশয় শারীরিক ভাল আছেন। এখানে আসিবার পক্ষে অন্যথা না হয়। আপনার সহিত অনেক কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয় আপনাকে নমস্কার দিয়াছেন ও আপনার পারিবারিক কুশল-সমাচার বিশেষরূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি ভাল আছি। আপনার ও মণির শারীরিক কুশল-সমাচার দানে বাধিত করিবেন। কোন্ তারিখে কোন্ ট্রেণে আসিবেন তাহা লিখিবেন। ইতি।" আমি এই পত্র পাইয়া ৩১শে শ্রাবণ (১২৯৪ সাল) কলিকাতা রওয়ানা হই। মহর্ষিদেবের দর্শনলাভ বিষয়ে ইহাই আমার পক্ষে অভাবনীয় সুযোগ।

(৪)

পরদিন অর্থাৎ ১২৯৪ সালের ৩২শে শ্রাবণ প্রাতে আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মহর্ষিদেবের দর্শন লালসায় তাঁহার তৎকালীন আবাসস্থান ৩নং মিড্‌লটন্‌ রো ভবনে উপস্থিত হই। পণ্ডিত্‌ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও রামনাথবাবু আমাকে পরম আদরে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্মগীতা" পুস্তক একখানি আমাকে উপহার প্রদান করেন। ইহা মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট কবিতায় রচিত।

অতঃপর মহর্ষির পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হই। এই সময় মহর্ষির বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর ৩ মাস। ইতঃপূর্ব্বে গুরুতর পীড়ায় তাঁহার দেহ ভগ্ন হওয়ায় তাঁহাকে অধিক জরাগ্রস্ত বোধ হইল। তাঁহার দর্শন ও শ্রবণশক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে, কিন্তু 'যোগাগ্নিময় শরীর' ব্রহ্মবর্চ্চসে সমুজ্জ্বল। আমার ডায়ারীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখিত আছে। মহর্ষিদেবের মুখের কথা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য ধারণ করিয়া অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি —৩২শে শ্রাবণ ১২৯৪ সাল * * * বেলা ৩টার পর মহর্ষির

সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইদিন জীবনের অতি পবিত্র দিন। যিনি আমাদের ধর্ম্মজীবনের গুরু যাঁহার আধ্যাত্মিকতার আমরা উত্তরাধিকারী, তাঁহার দর্শন লাভ পরম আনন্দের ব্যাপার। সে সময় আমার প্রাণ পবিত্র আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির শরীর এখন খুব দুর্ব্বল বোধ হইল, কিন্তু আত্মার তেজ যেন দুর্ব্বল শরীর ভেদ করিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে। * * * তাঁহাকে পরমাত্মাতে নিমগ্নচিত্ত দেখিলাম। যোগসমাধিধ্যানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। ভক্তিভরে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন করিলাম। বোলপুর ব্রাহ্মসমাজের কথা, কয়জন ব্রাহ্ম, কোন বারে উপাসনা হয়, উপাসনাতে অন্য লোক যোগ দেয় কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার অবস্থা, ঔষধের ব্যবসায় চলে কি না, এ দেশের লোক ইংরাজি ঔষধ খায় কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। * * * উপাসনা করিবার ঘর নাই বলাতে বলিলেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরে খ'ড়ো ঘরে উপাসনা করনা কেন। আমি শান্তিনিকেতনের ভগ্নাবস্থা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আর যাইনা, এইজন্য অবস্থা খারাপ হইয়াছে। ইহার পর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা উঠিল। পর্ব্বত গুহার কথাতে বলিলেন, তোমরা 'ব্রাহ্মধর্ম্মে' পড়িয়া থাকিবে

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদনিহিতং গুহায়াং"—ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তোমরা উপাসনার সময় পাঠ কর? ইহাঁতে যে গুহার কথা লেখা আছে, তাহাই যথার্থ গুহা। সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের গুহাতে বাস করিতে পারিলেই মানুষের পরিত্রাণ হয়। তারপর বলিলেন, পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বনিয়াদ্, আত্মা তাঁহাকে বনিয়াদ্ করিয়াই স্থিতি করে। দেখ লোকে প্রশংসা করিয়া বলে অমুক বনিয়াদী লোক, অমুক বনিয়াদী ঘর। তাহার অর্থ ইহারা স্থায়ী, অনেক দিন হইতে এই বংশ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহাকে যে বনিয়াদ্ করিতে পারিয়াছে, তাঁহার উপর সে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, সেই যথার্থ বনিয়াদী লোক। তাঁহাকে যে বনিয়াদ্ অর্থাৎ পত্তনভূমি না করিয়াছে সে বনিয়াদী নহে। দেখ সংসারের কোন আঁট নাই, কোন বনিয়াদ্ নাই, দেখ সংসারের কি চঞ্চল অবস্থা, আজ যে রাজা কাল সে ভিক্ষুক—এই বলিয়া সংসারের অস্থায়িত্ববিষয়ে একটি বাক্য বলিলেন, তাহার অর্থ—আজ যে বিকশিত লাবণ্যযুক্ত পুষ্প, কাল সে শুষ্ক হইয়া যায়, সংসারের কিছুই স্থির নাই। তারপর বলিলেন, আমার নিদ্রা হয় না, সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকি। তারপর 'তুমি নিশিদিন আমার সঙ্গে থাক, তুমি শোক-তাপ নাশ

কর' এই মর্ম্মে একটি দিব্য গান করিলেন, দুঃখের বিষয় গানটি ভুলিয়া গিয়াছি। শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, আমার জীবনের আশা ফুরাইয়াছিল, ঈশ্বর-কৃপায় বাঁচিয়াছি, এবারে তাঁহার আদেশ হইয়াছে যে তুমি কেবল আমার কথাই কহিবে, আর কিছু করিও না, সেই অবধি সাংসারিক কথা বড় কহি না। কথা কহিলে কষ্ট হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তাঁর কথাতে আমার কোন কষ্ট হয় না, বরং আনন্দে থাকি। বলিলেন, আমি এখন দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি, অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যে যাইবার উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি, এখন আমার আর কোন কাজ নাই, দীক্ষাতে প্রস্তুত হইতে হইবে—সেই ব্রহ্মলোকে আনন্দধামে আমাকে যাইতে হইবে। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই—" এই সময়ে মহর্ষিদেবের কোন আত্মীয় উপস্থিত হওয়ায় মহর্ষি নীরব হইলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিলাম। পরে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের পীড়ার সংবাদের টেলিগ্রাম পাইয়া আমি বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

এই বৎসর কার্ত্তিকমাসে কলিকাতায় গিয়া পুনর্ব্বার মহর্ষিদেবের দর্শনলাভ করি। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই সময় তিনি কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীট্ ৫২।২নং বাড়ীতে

অবস্থান করিতেন। ইহার বিবরণ আমার ডায়ারীতে এইরূপ লিখিত আছে। (১২৯৪ সাল ২৩শে কার্ত্তিক) ২টার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জীবন ধন্য করি। প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল নির্জ্জনে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ হয়। তাঁর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলেই ঈশ্বরকে মনে হয়। তিনি যে সকল উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মকথা বলিতেছিলেন তাহা ধারণা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। উপনিষৎ ও হাফেজ হইতে ও নানকের আদিগ্রন্থ হইতে নানা প্রকার গভীর জ্ঞানের ও ভক্তির কথা বলিতেছিলেন। মহর্ষি বলিলেন, লোকে বলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া মিছা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি ফল? লোকে বোধ হয় তোমাদিগকে এই সব কথা বলিয়া থাকে। যে মানের উপাসনা করে সে মানী হয়, যে যশের উপাসনা করে সে যশোবান হয়, যে ব্রহ্মের উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও সেই মহানের উপাসনা করিয়া মহান হই। আত্মা অনন্তকাল তাঁহার প্রেম ও মঙ্গলভাবে উন্নত হইবে। আমরা যে কেবল ইহকালে তাঁহার করুণা উপভোগ করিতেছি তাহা নহে, অনন্তকাল তাঁহার কৃপা সম্ভোগ করিব। * * * সর্ব্বদাই হাফেজের শ্লোক বলিতেছেন। ঈশ্বর-প্রেমে যেন সদাই মগ্ন। মহর্ষি আবার

বলিলেন, ঈশ্বর আমাকে কি শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। পৌত্তলিকেরা দুর্গাপূজার সময় বিল্ববৃক্ষ পুতিয়া ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে, তাহারা বিল্ববৃক্ষ লইয়া থাকুক। বিল্ববৃক্ষে ঈশ্বর আছেন তাহাতে আমার কি। তিনি ত সকল স্থানেই আছেন। তিনি যে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমার আত্মাই যে মহাবিল্ববৃক্ষ। * * * হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমরা আমার নাম প্রধান আচার্য্য রাখিয়াছ। আমরা বহুদিনের প্রধান আচার্য্য। পীর অর্থ আচার্য্য বা গুরু, এবং আলী শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আমরা পীরালি, সুতরাং আমরা বহুদিনের প্রধান আচার্য্য। ইহা বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই প্রসন্ন ভাব দেখিয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। তিনি বলিলেন, উপনিষদে ঈশ্বরকে প্রজ্ঞানঘন—ঘনীভূত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ প্রজ্ঞার ডেলাস্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞার উপাসনাতে প্রজ্ঞান লাভ হয়। * * * কিন্তু আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে তিনি সৌন্দর্য্যঘন—জগতের সকল সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া দেখ, সকল সৌন্দর্য্য যেন একত্র হইয়াছে—সকল সৌন্দর্য্য তাঁহারই, তিনি সৌন্দর্য্যঘন। আকাশ চন্দ্র সূর্য্য পুষ্প বৃক্ষ যাহা কিছু সকলই তাঁহারই সৌন্দর্য্য। পক্ষী

দেখ, ছোট ছোট চড়ুই পক্ষীগুলি তুড়ুক তুড়ুক করিয়া খাবার খায়, দেখিতে কত সুন্দর।" অতঃপর আমি বিদায় লইয়া সেইদিনই লুপমেলে বোলপুরে প্রত্যাগমন করি।

ইহার পর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও রামনাথ বাবুকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতাম। তাঁহারাও আমার পত্রীয়ভাব মহর্ষির গোচর করিতেন। ১২৯৪ সালের ২৮শে মাঘ রামনাথবাবু আমাকে একখানি পোষ্টকার্ডে লিখিতেছেন—"প্রণামানিবেদন—আমি বোধহয় ৫ই ফাল্গুনের মধ্যেই যাইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আজ প্রাতে শাস্ত্রী মহাশয় পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয়কে আপনার ইচ্ছা ও প্রণাম জানাইলেন। আমি তখন তথায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। যে তারিখে যাইব তাহার পূর্ব্বদিনে আপনাকে লিখিব। * * *।"

ক্রমে মহর্ষি মহোদয় তাঁহার প্রিয় সাধনক্ষেত্র শান্তি-নিকেতনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন। ১০ই ফাল্গুন রামনাথবাবু বাড়ী যাইবার উপলক্ষে বোলপুরে আইসেন। তাঁহার সহিত এই সমস্ত বিষয়ে আমার অনেক আলোচনা হয়। তিনি কলিকাতা গিয়া ১৮ই ফাল্গুন তারিখে আমাকে যে পোষ্টকার্ড লেখেন তাহার সমুদায় অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। "প্রণাম নিবেদন—আসিবার সময়

আপনার মেয়েটিকে পীড়িত দেখিয়া আসায় মন বড় দুঃখিত আছে। ত্বরায় কুশল সংবাদ দানে বাধিত করিবেন। বোলপুরের ঘর মেরামত জন্য কীর্ত্তিকে তাগাদা করিবেন ও রামনাথ নায়েকের নিকট ১০৲ টাকা লইবেন। শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে পূজ্যপাদ কর্ত্তামহাশয়কে সমস্ত জানাইয়াছি। অনেক চিন্তা ও তল্লাসের পর তিনি বলিলেন যদি তোমার অঘোরবাবু আপন তত্ত্বাবধানে রাখেন তবে ভাল হয়। আমি বলিলাম তিনি মহাশয়কে বড় ভক্তি করেন ও শান্তি-নিকেতনের জন্য দুঃখিত হন। তাহাতে তিনি বলিলেন তুমি অঘোরবাবুকে চিঠি লিখিয়া জান। পরে সমস্ত লিখিব। আপনি যেরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন সেইমত শীঘ্র লিখিলে যাহা হয় একটা স্থির করিয়া পাঠাইব। ইতি—আপনার রামনাথ।

অতঃপর, ২১শে ফাল্গুন (১২৯৪) শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আলোচনার জন্য মহর্ষিদেবের আহ্বানে ৩টার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করি এবং পরদিন ও তৎপরদিন ২৩শে ফাল্গুন সোমবার বেলা ২টার পর মহর্ষিদেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। শুনিলাম, শান্তিনিকেতন আশ্রম ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি তিনজন ট্রাষ্টীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ট্রাষ্ট ডীড দলীল

সম্পাদিত হইবে। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে যেমন নানা সম্প্রদায়ের মঠ বা *আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, শান্তিনিকেতন সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মোপাসকদিগের মঠ-স্বরূপ হইবে। এতদিন সাধনপরায়ণ ব্রহ্মবাদিগণের নির্জ্জনে ভজনসাধনের উপযোগী কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিলনা। কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া মধ্যে মধ্যে মনের অনুকূল ও কোলাহলশূন্য শান্তরসাস্পদ স্থানে আত্মচিন্তা ও পরমাত্মার ধ্যানধারণা এবং সাধু সঙ্গে সদালোচনায় যাপন না করিলে জীবন একান্ত শুষ্ক হইয়া যায়। মহর্ষিদেব ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণের এই মহৎ অভাব অনুভব করিয়া তাহা মোচন করিতে চেষ্টিত হইলেন। সকল মঠেই "মঠধারী" বা "আশ্রমধারী" থাকেন। এখানেও একজন থাকিবেন। শ্রীযুক্ত দেবপ্রতিপালক বাবাজি (ইনি বর্দ্ধমানের সাধুবাবাজি নামে পরিচিত ছিলেন) "আশ্রমধারী" হইবেন। তাঁহাকেও এখানে উপস্থিত দেখিলাম।

মহর্ষিদেবের সহিত এই দুইদিন শান্তিনিকেতন-সম্পর্কিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। আমার জ্ঞানবিশ্বাসমত তাঁহার কথার উত্তর দিই। আমি বলিলাম, যাহাতে মহাশয়ের অর্থের সদ্ব্যবহার হয় ও ধর্ম্মের প্রচার হয় আমাদের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। ট্রাষ্টীগণ কলিকাতায়

থাকিবেন, সুতরাং তাঁহারা কাজকর্ম্ম দেখিতে পারিবেন না, তাঁহাদের অধীনে একজন ম্যানেজার বা সেক্রেটারী শান্তিনিকেতনে থাকা আবশ্যক। তিনি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর দিলেন। শান্তিনিকেতনের ভাবী পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার মনে নিরতিশয় ক্লেশ হইত। এক্ষণে ভগবৎকৃপায় ও মহর্ষির সদাশয়তাতে শান্তিনিকেতনের এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম। অতঃপর কতকগুলি আবশ্যক বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমি ২৪শে ফাল্গুন বোলপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ২৬শে ফাল্গুন ট্রাষ্ট ডীড্ দলিল সম্পাদিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে* এই ট্রাষ্ট ডীডের প্রতিলিপি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।—

"শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সাং মাণিকতলা কলিকাতা।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮১০ শক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী।
হাং সাং পার্কষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

স্নেহাস্পদেষু।

"লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা, যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট্।

"কস্য ট্রষ্টডিড্ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিষ্ট্রীক্ট্ রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনীর ডৌল খারিজান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ দিগরের নিকট হইতে মৌরসীপাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতালা ও দোতালা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী সত্ত্বে সত্ত্ববান ও দখলিকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত

শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টীস্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের সর্ত্তমত স্থলাভিষিক্তগণক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎলিখিত নিয়মমতে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত-গণের ঐ সম্পত্তিতে কোন সত্ব দখল রহিলনা। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল একব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্টডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ-বিপরীতে কখনো হইতে পারিবেনা। এই ট্রষ্টের কার্য্যসম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্যত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের

অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেকনা। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবেনা। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবেনা। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবেনা। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবেনা। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটী মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবেনা ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবেনা, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই

মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয়, তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্নসহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাঁহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয়

তাহাহইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখন এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলান জন্য দ্বিতীয় তফ্‌শীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলিবন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তিসকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দারা গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট বা কোনরূপ নিরাপদ মালিকি স্বত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা

মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোনরূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসারী নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসারী নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোনরূপ দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায়সংযোগ করিতে পারিবেন না ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোনরূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ী হইবেনা। কিন্তু দ্বিতীয় তফ্‌শীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গলিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণবশতঃ ঐ কুঠীদ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকা দ্বারায় গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি

ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক। এতদর্থে তৃতীয় তফ্‌শীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্ট ডিড্‌ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

"(স্বাঃ) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

পাঠকগণ দেখিবেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা গৃহের (যাহা এক্ষণে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত) ট্রাষ্ট ডীডের আদর্শে অতি উদারভাবে এই দলিল লিখিত হইয়াছে।

(৫)

আমি বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়া ২৬শে ফাল্গুন (১২৯৪) প্রাতে শান্তিনিকেতনে গিয়া ভৃত্যগণকে বাড়ী ও বাগান পরিষ্কার করিতে ও আশ্রমের ধ্বজা উড্ডীন করার জন্য একটি বাঁশ সংগ্রহ করিতে বলিয়া আসি। দুই একদিন পরে দেব-প্রতিপালক বাবাজি ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হয়েন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপনার্থে ৩রা চৈত্র সন্ধ্যার সময় বোলপুর ধর্ম্মসভা গৃহে শাস্ত্রী মহাশয় ও দেবপ্রতিপালক বাবাজি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এই সময় আমিও ইঁহাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া বিবিধ সাধুপ্রসঙ্গে উপকার লাভ করিয়াছিলাম।

এই স্থানে দেবপ্রতিপালক বা বর্দ্ধমানের সাধুবাবাজির বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। ইনি পঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। বেদান্ত অধ্যয়নের উদ্দেশে বর্দ্ধমানে আগমন করেন। রাজ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্নের নিকট তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব যে চারজন অধ্যাপক পণ্ডিতকে চারি বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে প্রেরণ করেন তারকনাথ তাঁহাদের অন্যতম। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহর্ষিদেবের পরামর্শমত রাজবাড়ীর মধ্যে "সত্যসন্ধায়িনী সভা" * নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

---

* সত্যসন্ধায়িনী সভার অনুষ্ঠান পত্র ও উপাসনা প্রণালীর বিবরণ সম্বলিত একখানি পুস্তিকা শান্তিনিকেতন গ্রন্থভাণ্ডারে আমি দেখিয়াছি, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার বৈদিক মন্ত্র এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত "নমস্তে সতে তে" স্তোত্র অবিকলভাবে উদ্ধৃত আছে। ১২৯১ সালে আমরা কএকজন বন্ধু একদিন সন্ধ্যার পর এই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়াছিলাম। তখন মহারাজ আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুরের আমল। উত্তরদিকের গেট্ দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদিকের এক দোতলা গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গৃহের নানা স্থানে এবং টানাপাখাতেও সোণার জলে "ওঁ তৎসৎ" লিখিত ছিল। পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য এবং একজন বাদক ও গায়ক সঙ্গীত করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, শুক্রবারে উপাসনা হইয়াছিল। পরে কোন্‌নগরের পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র

করিলে উক্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মহর্ষিদেব পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ও তারকনাথ তত্ত্বরত্নকে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। দেবপ্রতিপালক বা বর্দ্ধমানের সাধুবাবাজি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, প্রখর বুদ্ধিমান ও সুবক্তা মজলিসী লোক ছিলেন। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তিনি সভাস্থ লোককে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকা এরূপ লোকের পক্ষে অসম্ভব, এই জন্যই বোধহয় তিনি শান্তিনিকেতনে কএকদিন অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। তিনি এক্ষণে জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না। এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্র নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন ও শুদ্ধি প্রক্রিয়ার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সকল প্রদেশের কতকগুলি সাধু সন্ন্যাসী ও প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-

শিরোমণি এই সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই উপাসনা সভার অস্তিত্ব আছে কিনা বলিতে পারি না।

১২৫৬ সালে মহর্ষির সহিত বর্দ্ধমানাধিপতির মিলন সংঘটিত হয় এবং ১২৫৮ সালে রাজবাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রাজবাটীর সমাজ ব্যতীত বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ নামে আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বেদান্তাদি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ১৭৮২ শকে (১২৬৭ সালে) ইহা স্থাপিত হয়। এই সমাজবাটী কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে খরিদ করা হয়। তদবধি এই সমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

পণ্ডিত এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনে সহায়তা করিতেছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এক দেবপ্রতিপালক বাবাজির উদ্যোগ ও চেষ্টায় বাঙ্গালার যোগী বা যুগী জাতীর বহু সহস্র ব্যক্তি উপনয়ন সংস্কারপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণদিগের সহিত যুগীদের বিষম সংঘর্ষ ও দেশের বিবিধ সামাজিক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে স্বামী দেবপ্রতিপালক "চন্দ্রাদিত্য পুরাণ" ও "ধর্ম্মতন্ত্র" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই উপনয়ন আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশে যুগীজাতির স্থান অতি নিম্নে ছিল। অনেকে যুগীদিগকে হিন্দু-মুসলমানের বহির্ভূত অদ্ভুত জাতি বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি দাশরথি রায় পাঁচালীতে লিখিয়াছেন—

"মরাও নয় বাঁচাও নয় যেমন চিররোগী,
হিন্দুও নয় মুসলমানও নয় তা'র সাক্ষী যুগী।"*

শ্রীযুক্ত দেবপ্রতিপালক বাবাজি শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া যাওয়ার পর ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে বোলপুর প্রার্থনা সমাজের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব হয়। বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় অন্যত্র গমন করায় হেড্মাষ্টার বাবু নবীনচন্দ্র

* যুগীরা ব্রাহ্মণত্ব দাবী করায় অনেক বিভ্রাট ঘটেছিল ও নানা স্থানে ফৌজদারী মামলার সৃষ্টি হয়েছিল। অঃ চঃ।

মিত্র এবং আমি এই দুইজনে উৎসবের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই। এবার নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এবারেও আমরা শান্তিনিকেতনে একদিন উৎসব করিয়াছিলাম। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় এই উৎসবের সুদীর্ঘ বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহাতে আছে, "২০এ চৈত্র প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'শান্তিনিকেতন' নামক উদ্যান বাটিকাতে উপাসনা হয়।······শান্তিনিকেতনের মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে প্রাণ আপনাপনি উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, মহর্ষি মহাশয় এই স্থানে সাধারণ ব্রহ্মোপাসকগণকে উপাসনা করিবার অধিকার দিয়াছেন এবং এই আশ্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রহ্মবিদ্যালয়, পুস্তকালয়, অতিথিসেবার অভিপ্রায়ে বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন।"

৯ই বৈশাখ (১২৯৫) কলিকাতায় গিয়া বেলা ৩টার সময় মহর্ষিদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ধর্ম্মোপদেশক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অনুষ্ঠিত ব্রাহ্ম য়ুনিয়ন্ বিষয়ে অনেক কথা বলেন ও পুনর্জ্জন্ম ও ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

ইহার পর কলিকাতা হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া প্রাসাদের মেরামতি কার্য্য আরম্ভ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্বকৌমুদী হইতে শান্তিনিকেতনের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সাধনার্থী কেহ কেহ এই সময়ে আসিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ, যিনি পরবর্ত্তিকালে মৌনাবলম্বী হইয়া কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ওঙ্কারনাথের "মৌনীবাবা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নির্জ্জনে সাধনভজনের জন্য আগমন করেন। কিন্তু আশ্রমের সংস্কারকার্য্য সমাধা ও অতিথি অভ্যাগতের অবস্থানের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ইহাঁদিগকে ফিরিয়া যাইতে হয়। আমি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কখন সমস্ত দিন কখনও বা রাত্রি যাপন করিয়া বিবিধ জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা করিতাম। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে আশ্রম প্রাঙ্গনের বৃক্ষ পল্লব স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে ঝলমল করিত, নির্জ্জন আশ্রমের প্রশান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতাম।

শান্তিনিকেতনের মেরামত সমাধা হইলে প্রয়োজনীয় বিবিধ গৃহসজ্জায় প্রাসাদ সুসজ্জিত হইল এবং আশ্বিন মাসের শেষে দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে মহর্ষিদেবের পুত্র প্রভৃতি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এই সময় আমি বর্দ্ধমানের

অন্তর্গত আমার বাসগ্রামে যাই। বোলপুরে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরবাবুদের জনৈক কর্ম্মচারী, বাবু রত্নেশ্বর চৌধুরী, বোলপুরে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও ২।৩ দিন আসিয়া আমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। *

অতঃপর ৩রা কার্ত্তিক (১২৯৫) প্রাতে আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। ইতঃপূর্ব্বে মহর্ষিদেবের পুত্র পৌত্র কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে নাই। দ্বিপেন্দ্রবাবুর আলাপ আপ্যায়নে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি বলিলেন যে আগামী কল্য শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এখানে একটি সভার অধিবেশন ও ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। দেখিলাম বিবিধ বহুমূল্য গৃহোপকরণে আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়াছে, মহর্ষিদেব তাঁহার নিজের ব্যবহৃত সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গলা বহুসংখ্যক পুস্তক ও পুস্তকাধার আশ্রমে দান করিয়াছেন। কন্যাকে প্রথমবার স্বামিগৃহে পাঠাইবার সময় যেমন পিতামাতা নিজের অবস্থানুরূপ গৃহস্থের প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য যৌতুকরূপে প্রদান করেন মহর্ষি-

কেও সেইরূপ খাট পালঙ্কাদি শয্যাদ্রব্য, টেবিল, চেয়ার, কৌচ, কার্পেট্, পাকশালায় আবশ্যক বিবিধ তৈজসপত্রাদি, এমন কি সূচ সুতাটি পর্য্যন্ত, দিয়া আশ্রমকে সাজাইয়া দিয়াছেন।

পরদিন, ৪ঠা কার্ত্তিক, অপরাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা হয়, আমি তৎপূর্ব্বেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমার লিখিত যে পত্রখানি ১৮১০ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন নামক একটি সুন্দর উদ্যান ও উদ্যানমধ্যস্থ শোভাময় পরম রমণীয় প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। এই উদ্যানবাটির চারিদিকেই উন্মুক্ত আকাশ ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে শাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী মুক্ত বায়ুতে সদাই ক্রীড়াশীল। তরুরাজি বিহঙ্গকূজিত হইয়া সংসার-তাপিত হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিতেছে; নিকটে নির্ম্মলতোয়া সুপ্রশস্ত বাঁধ ও উদ্যান, ভিতরে সুগভীর প্রশস্ত ইন্দারা। এ স্থান সাধনার অতীব অনুকূল, যেমন নির্জ্জন, তেমনি শান্তিময়, পবিত্র ও রমণীয়।

এখানে আসিলে সংসার-কোলাহল আপনিই অন্তর্হিত হয়। মানবহৃদয় স্বভাবতই ঈশ্বর-চিন্তার জন্য ব্যাকুল হয়। এই নিকেতন যথার্থই শান্তিনিকেতন, ধর্ম্মপিপাসু নির্জ্জন সাধকের অতি প্রিয় পদার্থ। এইস্থানে পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয় বহুকাল ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই উদ্যান ও উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদ প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে মেরামত ও সুসজ্জিত করিয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং এই শান্তিনিকেতনে নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মপ্রচার, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, পুস্তকালয় ও অতিথিসেবার অভিপ্রায়ে এই সুসজ্জিত শান্তিনিকেতন এবং বার্ষিক ১৮০০৲ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে কেবল ধর্ম্মার্থে উপযুক্ত ট্রাষ্টীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখানে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্র সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল অবস্থার লোকই যাহাতে এখানে পরম যত্নে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারেন, এই প্রকার সাজসজ্জা আসবাবাদি ভূরি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে।

"আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্, যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইঁহারা দুইজনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্রবাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ও দুই-চারিটি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিনীবাবু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর রায়পুর সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লি হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২০০ শত লোক আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষির নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু সাধারণের তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তিই ইহার কারণ। সভাভঙ্গের পর সমাগত

বন্ধুগণকে সরবত ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

"পূজ্যপাদ মহর্ষি মহোদয়ের দানশীলতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবনের প্রথম হইতেই বিষয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন। যাহাতে দেশ মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা জাগ্রত হয়, দেশবাসী লোকের মন ধর্ম্মপ্রবণ হয় সেজন্য সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় সদাই ব্যাকুল, তাই বহুমূল্যের ভূসম্পত্তি ও তাঁহার এই প্রিয় শান্তিনিকেতন, যাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হইয়াছে, কেবল ধর্ম্মোন্নতির জন্য দান করিলেন। এ প্রকার সাধু দৃষ্টান্ত এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার মহর্ষি নাম সার্থক, পরমেশ্বর তাঁর শুভসংকল্প সিদ্ধ করুন।

"এই শান্তিনিকেতন আশ্রম দ্বারা এতদ্দেশের ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সাহায্য হইবেক। এই আশ্রম ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের সাধনভূমি। তাঁহার সাধনাতে এই আশ্রমের প্রত্যেক ধূলিরেণু পবিত্র হইয়াছে। যাঁহারা বিষয়কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত, সংসারের শোক দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও সাধনশীল, পাপতাপের যন্ত্রণা দূর করিতে যাঁহারা যত্নবান,

তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে পূজ্যতম মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে আগমন করুন, বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, যথার্থ ঋষিজীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

"পরিশেষে মহর্ষি মহাশয়ের পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নতিকল্পে অটল অনুরাগ ও গভীর উৎসাহের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হউক। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু, দ্বিপেন্দ্রবাবু, মোহিনীবাবু, রমণীবাবু প্রভৃতি যাঁহারা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য এখানে আগমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

পরে ৯ই কার্ত্তিক বুধবার (১২৯৫), সন্ধ্যার পূর্ব্বে, শান্তি-নিকেতনে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার আরম্ভ স্বরূপে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে আমি আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করি, বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় সঙ্গীত করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে উপাসনার কার্য্য সম্পাদিত হয়। বোলপুর হইতে ৫।৭ জন ভদ্রলোক যোগ দিয়াছিলেন।

পূজপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রমে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া ১১ই কার্ত্তিক বেলা ৩টার সময় শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হই। এই অগাধ জ্ঞানগম্ভীর অথচ অমায়িকস্বভাব ঋষিকল্প মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিলাম। প্রায় ৩ ঘণ্টা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিলেন। এই সময় 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে' তাঁহার লিখিত "ক্যাণ্টের দর্শন ও বেদান্তদর্শন" প্রস্তাব প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি আহার করিতে গেলে তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গে তন্ময় হইলেন।

(৬)

ইহার পর শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তি-নিকেতনের যাবদীয় কার্য্যভার আমার হস্তে প্রদানের অভিপ্রায় অন্যের দ্বারা আমার গোচর করেন। আমি বিশেষ চিন্তা ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এ বিষয়ে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করি। শান্তিনিকেতনে বাস করিলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় এবং সাধুচরিত্র মহৎলোকের সঙ্গলাভে আমি

জীবনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারিব এই আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। সংসারের ভবিষ্যৎচিন্তায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। আমি মাতুল মহাশয়ের সহিত অংশে ঔষধের কারবার করিতাম। আমার এই সংকল্প তাঁহাকে অবগত করিলে তিনি বাধা প্রদান করিবেন বিবেচনায় তাঁহাকে জানাইতে সাহস করিলাম না।

অনন্তর মহর্ষিদেবের আহ্বানে ২১শে কার্ত্তিক (১২৯৫) ৩টার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করি এবং ২২শে কার্ত্তিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। এই বিবরণ আমার ডায়ারিতে এইরূপ লিখিত আছে।—

ইতঃপূর্ব্বেই ট্রষ্টীরা ও মহর্ষি মহাশয় আমাকে শান্তি-নিকেতনের আশ্রমধারী নিযুক্ত করা স্থির করিয়াছেন। প্রথমে মহর্ষি মহাশয়কে প্রণাম করিলেই উপবেশন করিতে বলিলেন; তৎপরে বলিলেন, "ট্রষ্টীদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, তুমি শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী হও।" আমি তাহাতে আহ্লাদসহকারে সম্মতি দিলাম। "ধর্ম্ম লইয়া থাক, তোমার আত্মার উন্নতি হইবে। তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার কোনো ভাবনা নাই, আমি তোমাকে বরণ করিলাম, গ্রহণ করিলাম।" তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত

দ্বিপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "আঘোরনাথ যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" তৎপরে আমাকে বলিলেন "আজ প্রথম দিন, তোমাকে কিছু উপদেশ দিই"। এই বলিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে অনেক উপদেশ দিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ও প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা করিলেন, এবং নিজের জীবনের ৩টি ঘটনা হইতে পরকালের ভাব বুঝাইলেন। শেষে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন "অঘোরের স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে, আমি গ্রহণ করিলাম, তোমরা রক্ষা করিবে।" আমি প্রায় ৩ ঘণ্টা সেদিন ছিলাম।

তৎপরে কএক দিন পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে উপাসনা প্রণালী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের হ্রস্ব দীর্ঘ ও উদাত্ত অনুদাত্ত ভেদে বৈদিক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা অভ্যাস করিলাম।

আমি বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়া মাতুল মহাশয়কে আমার শান্তিনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করার কথা অবগত করিলাম। তিনি দুঃখিত হইয়া আরও কিছুদিন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং আমাকে আরও বেশী লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমি মহর্ষিদেবের নিকট

স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি, আর আমি ত নিকটেই থাকিতেছি, প্রয়োজনমত কারবারের তত্ত্বাবধান করিতে পারিব, সুতরাং কারবারের কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি ইহাতেই অগত্যা সন্তুষ্ট হইলেন এবং কার্যতঃ কারবার আমার তত্ত্বাবধানে কর্ম্মচারী দ্বারা চলিতে লাগিল।

অনন্তর ৭ই অগ্রহায়ণ (১২৯৫) আমি সপরিবারে, অর্থাৎ আমার স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র মুণীন্দ্র, দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বয়সের কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতনে আসিলাম। লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনসঙ্গশূন্য প্রান্তরে কেবল আশ্রমের ভৃত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া বাস করা আমাদের প্রথম প্রথম অতিশয় ক্লেশকর মনে হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাস হইল। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে ব্রহ্মোপাসনা হইত, বোলপুর হইতে বাবু হরিদাস বসু উকিল ও হেড্ মাষ্টার নবীনবাবু নিয়মিত আসিতেন এবং রাত্রিতে আশ্রমেই থাকিতেন। কোন কোন সপ্তাহে আরও অনেকে উপাসনায় যোগ দিতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে বোলপুরে আসিয়া বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইতাম। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিনিকেতন হইতে বাঁধগোড়া হাই স্কুলে যাতায়াত করিত।

আশ্রমে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ, ট্রষ্ট্ ডিড্ দলিলের প্রতিলিপি পাঠে পাঠক তাহা ইতঃপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন

আমি বহুদিন পর্য্যন্ত নিরামিষভোজী ছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী ও পুত্রেরা একান্ত অনভ্যস্ত। শান্তিনিকেতন সীমানার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণাংশ হইতে প্রায় ২ রশী দূরে বাঁধের নিকটে ১ বিঘা ভূমির উপর একটি খড়ের বাঙ্গালা ছিল, ইহাকে 'নীচু বাঙ্গালা' বলা হইত। এই বাঙ্গালার জমি মহর্ষিদেবের হিমালয় ভ্রমণের অনুচর কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে বার্ষিক ।০ আনা খাজনায় বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছিল। ইহা শান্তিনিকেতন ট্রাষ্ট সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সুতরাং এইস্থানে আমিষ আহার নিষিদ্ধ ছিল না। আমাদের যেদিন মাছ খাইবার একান্ত ইচ্ছা হইত সেদিন এখানে আসিয়া তাহা আহার করিতাম। এই বাঙ্গালার চারিদিকে কোন প্রাচীর বা বেড়া ছিল না। সম্মুখভাগে কতকগুলি আমলকী বৃক্ষ থাকায় ইহাও আশ্রম কাননের ন্যায় শোভমান ছিল। পরবর্ত্তিকালে তৃণাচ্ছাদিত বাঙ্গালার পরিবর্তে লাল টাইলের ছাদ বিশিষ্ট সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইস্থানে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। *

---

* কেউ কেউ অনুমান করেন যে শান্তিনিকেতনের ইমারত প্রস্তুত হবার আগে মহর্ষিদেব 'নীচু বাংলোয়' বাস করতেন। পিতৃদেব অনেক বৃদ্ধ লোকের কাছে শুনে-ছিলেন যে তিনি এখানে অনেক সময় তাম্বুতেই বাস করতেন। এ বাংলোটি বড়

ইহার পর ক্রমেক্রমে নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় মুন্সেফ্ বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, রায়পুরের বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ এবং আমার পুরাতন বন্ধু বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় প্রভৃতি যাঁহারা কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন এবং আমাদের নির্জ্জন বাসের অসুবিধা দূরীভূত হইতে লাগিল।

রায়পুর গ্রামে একদিন ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু রবীন্দ্রনাথ সিংহ ভায়াকে অনুরোধ করায় তিনি উপাসনা সভার উদ্যোগ করেন। ২২শে পৌষ বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র হেড্ মাষ্টার মহাশয় এবং আশ্রমে আগত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত বাবু বিনোদবিহারী রায় সমভিব্যাহারে আমি প্রতাপবাবুর হাটপুকুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হই। রায়পুরের প্রধান জমিদার বাবু গৌরাঙ্গসুন্দর সিংহ মহাশয়ের আটচালাতে অপরাহ্নকালে সভার অধিবেশন

ছিলনা, শান্তিনিকেতনের কূপ খনন করার আগে জলের সুবিধার জন্তে বাঁধের কাছে প্রস্তুত হয়েছিল। ছোট হলেও মহর্ষিদেব এখানে অল্পদিনের জন্তে বাস করে থাকতে পারেন। এ স্থান কেন কিশোরীবাবুর নামে লওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না। জঃ চঃ

হয়। সকলেই সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি উপাসনা করি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু ব্যাখ্যা করি। বিনোদবাবুও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। মহর্ষিদেবের 'উপহার' পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। যাহাতে প্রতি মাসে এই গ্রামে ব্রহ্মনাম হয় সেজন্য অনেকে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গাধীন বিনোদবাবু সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কিছুদিন পরে বিনোদবাবু ও তাঁর কএকজন বন্ধুর মতামত উৎকটভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা জাতীয় বা কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া সার্ব্বজনীনতা প্রদর্শনের জন্য বিচিত্র উপাধিযোগে আপনাদের নাম উল্লেখ করিতেন। কেহ হইলেন সৈয়দ মুকুন্দ গড্‌সন্ (Godson), কাহারও উপাধি "ব্রহ্ম সন্তান"। বিনোদবাবু "লেডি ফ্রেণ্ড্" (Lady Friend) উপাধিতে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের অন্যান্য উদগ্র মত ও হাস্যজনক আচরণের বিষয়ে অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না। শুনিয়াছি, এই বিনোদবাবু খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক রেভারেণ্ড্ বিনোদবিহারী রায় নামে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন।

এই নিবন্ধের প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছে যে শান্তি-নিকেতনের উত্তরপশ্চিম দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পূর্ব্বে দস্যুগণ পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিত; দস্যুহস্তে অনেকের প্রাণান্তও ঘটিত। ১২৯৫ সালের ১৯শে ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত প্রান্তর নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। শান্তিনিকেতনের উত্তরাংশে রেলওয়ে ব্রীজের দিক হইতে পুনঃ পুনঃ চীৎকারশব্দ আসিতে লাগিল। কোন পথিক বিপন্ন হইয়াছে অনুমান করিয়া আমি আশ্রমের ২ জন ভৃত্যকে আলোসহ পাঠাই-লাম। ভৃত্যেরা শব্দ অনুসরণ করিয়া উচ্চস্বরে ভয় নাই, ভয় নাই হাঁকিতে হাঁকিতে, ব্রীজের নিকটে যাইয়া দেখিল একখানি ছৈওয়ালা গরুর গাড়ীতে ২ টি সন্তানসহ একটি স্ত্রীলোক শীতে কাঁপিতেছে, সঙ্গে কেবল একজন গাড়োয়ান। ইহারা বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সুপুর গ্রামে যাইবে। অন্ধ-কারে পথ ঠিক করিতে না পারিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে, এমন সময় একজন লোক সম্মুখে আসিয়া বিপরীত দিকের পথ দেখাইয়া দেয় এবং বলে যে এইস্থান ভাল নহে, গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখ। এই কথায় সন্দেহ হওয়ায় এবং দূর হইতে আশ্রমের আলোক দেখিয়া ইহারা চিৎকার করিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে

ভৃত্যেরা গাড়ী সমেত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত-কথা বলিল। স্ত্রীলোকটি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার স্ত্রী ইঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ইহাদিগকে জলযোগ করাইয়া সুপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ২ দিন পরে বাঁধগোড়া ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক সুপুর নিবাসী বাবু গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন যে স্ত্রীলোকটি তাঁহার আত্মীয়া, কেবল আশ্রমের জন্যই সেদিন ইঁহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। ইহার পর আমি ৮ বৎসরের অধিককাল আশ্রমে ছিলাম আর কখনও এরূপ ঘটনার কথা আমার জ্ঞানগোচর হয় নাই।

* স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় পিতৃদেব তাঁর বিবরণ শেষ করতে পারেন নাই। এ-বিষয়ে এই পুস্তকের আমার লেখা ভূমিকা দ্রষ্টব্য।—জ্ঞঃ চঃ।

শান্তিনিকেতনের কথা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের কথা

লোক-কোলাহল হতে দূরে, বোলপুর রেল্ স্টেশন হতে আড়াই মাইলের মধ্যে এক দিগন্তপ্রসারিত নির্জন প্রান্তরে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিয়ে মাঝে-মাঝে সাধনভজনের জন্যে বাস করতেন। এই অনুর্বর স্থানে বহুব্যয়ে একটি বাগান করেন এবং স্থানটির নাম দেন 'শান্তিনিকেতন'। বার্ধক্য-হেতু ১২৯০ সালের পরে তিনি আর এখানে আসতে পারেন নাই। কিঞ্চিদধিক তিন বছর এ-স্থান অব্যবহৃত অবস্থায় অতিশয় অযত্নে পড়ে ছিল। এই সময়ে ক একজন ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি বোলপুরে একটি প্রার্থনাসমাজ গঠন করেন, কিন্তু সহরে উপাসনায় বহু বিঘ্ন ঘটায় এখানে এসে উপাসনা করতেন। পূর্বে তাঁরা মহর্ষিদেবের অনুমতি নেন নাই। তিনি যখন এ-বিষয় অবগত হবেন তখন বিশেষ আনন্দ লাভ করবেন এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। এই সময়ে, যখন তাঁরা শুনলেন যে মহর্ষিদেব এ-স্থানটি না-ও রাখতে পারেন তখন তাঁকে উপাসনার কথা জানানো হয়। সেই সঙ্গে এই স্থানটিকে রক্ষা করার আবেদনও ছিল। যতদূর

জানা যায়, আমার পিতৃদেব এই সকল উপাসকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, কারণ, দেখি তিনিই যা-কিছু করবার করেছিলেন। মহর্ষিদেব বিষয়টি বিবেচনা করেন, এবং পিতৃদেবের সঙ্গে কএকবার আলোচনা করে পরে এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা স্থির করেন।

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। এটা জমির পাট্টা লওয়ার তারিখ (১২৬৯ সাল)। এর পর প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১২৯৪ সালের আগে, মহর্ষিদেব যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা স্থির করেন নাই তা কাগজপত্র হতে জানা যায়। দেখা-শোনার অভাবে এ-স্থানের সৌষ্ঠব অনেক নষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুত এ-স্থানে মহর্ষিদেবের নিজের আর প্রয়োজন ছিলনা। শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাস পিতৃদেব-কর্ত্তৃক লিখিত বৃত্তান্তে আছে। বর্ত্তমান সময়ে এ-স্থানকে আর নির্জন ও শান্তিপূর্ণ বলা চলেনা, কিন্তু প্রান্তরের পরিচয় এখনো চারিদিকে বর্ত্তমান দেখা যায়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্ট্‌ডীড্‌ হতে জানা যায় যে মহর্ষিদেব আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেন একেশ্বর-বাদীরা এখানকার শান্তিপূর্ণ অনুকূল পরিস্থিতিতে নিরাকার

একব্রহ্মের উপাসনা, ধ্যানধারণা ও সাধনভজনের জন্মে সুযোগ লাভ করেন। এই হলো এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মালোচনা ও উপাসনা সম্বন্ধে এবং আশ্রম-পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে, মহর্ষিদেব এই সমস্তকে সমগ্রভাবে আশ্রমধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন, এবং এই আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্মে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা এবং অতিথিশালা পরিচালনার বিধান দিয়েছেন।

এক সময় তাঁর পুত্র পূজনীয় গুরুদেব * রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক-বালিকার শিক্ষা একটা সমস্যারূপে প্রতীয়মান হলো। তাঁর নিজের সন্তানদের জন্মে যথাযোগ্য ব্যবস্থা আবশ্যক, কিন্তু তখনো তাঁর মনে আছে সাধারণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপন বালক-বয়সের বিভীষিকা। যখনকার কথা বলছি সেইসময়ে বঙ্গদেশের বহু ছাত্রের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উপর নূতন করে বীতশ্রদ্ধ হলেন। তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করে শিলাইদহে আপন পুত্রকন্যাদের জন্মে শিক্ষালয় খুললেন, এবং শিক্ষা সম্বন্ধে

* আমি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে এই আশ্রমে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করি। ছাতিমতলায় তাঁর পিতৃদেবের উপাসনা-বেদী হতে তিনি ১৩১৭ সালের ৭ই পৌষ তারিখে প্রাতে আমাকে দীক্ষিত করেন।

জোর আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌লো। দেশের দিকেও তাঁর মন ফিরে আছে। বুঝেছেন, বিদ্যালয়গুলি প্রকৃত মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে নিয়ত না হলে দেশের কল্যাণ নাই। বহু চিন্তার পর ভারতের পুরাতন আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি দেখেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম সেইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান, এবং সেইজন্যে মহর্ষিদেবের অনুমতি গ্রহণ করে ১৩০৮ সালে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর নাম হয়েছিল 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'; পরে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নাম রাখা হয়। পূর্বেই বলেছি, মহর্ষি-দেবের শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্ট্‌ডীডে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের নির্দেশ আছে।

এরপর গুরুদেবের জীবনের বিকাশ সমগ্র জগতের বিস্ময়ের বিষয় হয়েছে, এবং তাঁর প্রভাবের বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয়টিও নানাভাবে ও নানাদিকে, তিনি যেমন চেয়েছিলেন, মানবজীবনের নানা সমস্যার সমাধানের উদ্দেশে, বহুমুখী হয়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। পরে এই প্রতিষ্ঠান আজ প্রায় সাতাশ বছর বিশ্বভারতী-নামে তাঁরই অনুপ্রেরণার গুণে বহুদেশে প্রভাব বিস্তার করেছে, ভারতের সার্ব-ভৌমিক্ বাণী বিশ্বের কাছে ধরে দিয়েছে।

বিশ্বভারতীর ট্রাস্ট্‌ডীড্‌ হবার সময়ে আশ্রমের ট্রাষ্টীরা, বলতে গেলে, বিশ্বভারতীর ট্রাষ্টীগণকে তাঁদের কাজেরও ভার অর্পণ করেছেন। যে কারণেই হোক্‌, এখন আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্যটির কথা অধিক লোকে স্মরণ করেন না, অনেকে জানেনও না। বস্তুত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যে মহর্ষিদেব তা-ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ভুল এতদূর হয়েছে যে ছাতিমতলায় মহর্ষিদেবের উপাসনা-বেদীটিও আর দেখা যায়না। এখান থেকেই এমন কথাও লেখা হয়েছে যে এ-বেদীতে মহর্ষিদেব বসেন নাই, এ-বেদী তিনি দেখেন নাই।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের গুরুত্ব এই-যে প্রায় লুপ্ত হয়েছে, স্থানটিকে দেখ্‌লে এবং সেখানে বাস করলে আর তাকে আশ্রম বলে মনে হয়না, এবং এমন কোনো চেষ্টাও দেখা যাচ্ছেনা যে পুনরায় আশ্রমের জন্যে লোকের আগ্রহ হতে পারে, এখন যাঁরা এ-বিষয়ে কিছু জানেন তাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য তা লিপিবদ্ধ করা। পিতৃদেবের কাগজপত্র হতে এ-স্থান সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলি উদ্ধার করে যে প্রকাশ করলাম তা সেই কারণেই, আর আমিও যে এই কথাগুলি লিখ্‌চি তারো কারণ ঐ একই। এই কাজের ফলে এখানকার

আশ্রমিক দিক যদি পুনরায় কিছুমাত্র যত্ন লাভ করে শ্রম সার্থক হবে।

আমার নিজের পরিচয় একটু দেওয়া ভালো, কারণ অনেকেই আমাকে চিন্‌বেননা। এক সময়,—একচল্লিশ বছর আগে,—আমি আশ্রম-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে আসি। এখানে কাজ করেছি কিছুকাল, তারপর অনেক জায়গায়, এবং শেষ বয়সে এখানেই ফিরে এসে বাস করছি। এখন বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহারিক যোগ না-থাকলেও এখানকার সমস্তের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক এমন যে আমি নিজে ইচ্ছা করলেও তা ছিন্ন করতে পারি না। ভোরের বেলা এবং সমস্তদিনই সেই ঘণ্টাধ্বনিগুলি শুনি যার নির্ঘণ্ট একদিন আমিই প্রস্তুত করে গেছি। যখন বিভিন্নভাবে ঘণ্টাধ্বনি করে আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয় তখন ছাত্র-পরিচালনার ভার আমার উপরে ছিল, সুতরাং এই কোড্‌ তৈরির সুযোগ আমিই পেয়েছিলাম। আর কোড্‌ এমনি ব্যাপার যে একবার চলে গেলে তা বদ্‌লানো তেমন সহজ হয়না, এবং সে-কোডে অসুবিধাজনক কিছু ধরা পড়লেও, তা-ই নিয়েই কাজ চালাতে হয়। আমি সেই সময়ে যে ছাত্র-পরিচালনার কাজ করতাম, বিশেষ যোগ্যতা উপার্জন না-করেও, তার

পুরস্কার প্রতিদিনই পেয়ে থাকি। মহতের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য ঘটলে এরূপ হয়।

ঠিক এমনিভাবে, এতেও কোনো যোগ্যতার পরিচয় না-থাকলেও, বল্‌তে চাই যে আমি শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসী প্রথম দুটি শিশুর একটি। অন্যটি ছিলেন আমারই ভগিনী। দুঃখের বিষয়, আমরা যখন আসি তখন, অথবা তার আগে আশ্রমে বাস করেছেন, আমি ভিন্ন এমন আর কেউ আজ জীবিত নাই। আমি অল্পবয়সে আশ্রমে বাস করে যা অনুভব করেছি তা ভুলি নাই; তার কারণ এখানকার আশ্রমিক জীবন তখন ছিল নিবিড় এবং সেইজন্যে মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তবু, বালক-বয়সের স্মৃতি হতে, বিশেষভাবে এরূপ বিষয়ে, তথ্যবহুল বিবরণ দেওয়া কঠিন। আমি গভীর কোনো বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করবোনা; কেবল যা মনে আছে, এবং পিতৃদেবের কাগজপত্র পাঠ করে যা ভালোরূপে স্মরণ করতে পারি তাই বল্‌বো। একথা অসংকোচেই বল্‌ছি যে তখন আশ্রম মহর্ষিদেবের নির্দিষ্ট পথে আশ্রমরূপে চল্‌ছিল।

আমি আশ্রমের লোক, এবং বিদ্যালয়েরও। এ-দুটিকে এক করে দেখার শিক্ষা গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি। এ-দুটির কোনোটির উপর আঘাত, যতো অল্পই হোক,

অসহ্য পীড়া দেয়। পীড়া পেলে মানুষ স্বভাবত যা করে তাতে অন্যের বিরাগ ঘটায় কোনো লাভ নাই। মনে-মনে জানি, আশ্রমের পুরাতন কথার আলোচনা-দ্বারা মহর্ষিদেবের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

আশ্রম ব্যর্থ হয়েছে আপনা-আপনি, অথবা বিদ্যালয়ের জন্যে, অথবা আশ্রম ব্যর্থ হওয়ার পরে বিদ্যালয় স্থানটির মহিমা কতকটা বাঁচিয়ে রেখেছে, এইরূপ নানা মনোভাব নিয়ে কিছু-না-কিছু বলা ও লেখা হয়েছে। তার ফল আশ্রম কি বিদ্যালয় কোনোটির পক্ষেই সম্মানকর হয় নাই। মধ্যে থেকে মহর্ষিদেবের স্মৃতির প্রতি অবিচার হয়েছে, এবং কতকগুলি বাজে কথার উদ্ভব ঘটেছে। কএকটা অন্যায় কাজও হয়ে গেছে।

৺অজিতকুমার চক্রবর্তী কৃত মহর্ষিদেবের জীবনচরিতে আশ্রম সম্বন্ধে এমন কতকগুলি আলোচনা দেখি যা অজ্ঞাত প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মতো। মহর্ষিদেবের আশ্রম-পরিকল্পনাই ছিল ভুল, বিদ্যালয়ই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল,—প্রকারান্তরে এইভাবে মহর্ষিদেবের কাজের সমালোচনা করা হয়েছে। এ-সব হতে বিদ্যালয় বুঝি কিছু-কিছু সমর্থন লাভ করে, উপরি-উপরি দেখলে এরূপ মনে হতে পারে; কাজেই এ-গুলির প্রতিবাদ কারো-কারো কাছে

অপ্রিয় হবে এমন আশঙ্কা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-সমস্ত বিদ্যালয়কে আদৌ কোনো সহায়তা করেনা, একটু তলিয়ে দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। সুতরাং এ-প্রসঙ্গ অপ্রিয় হওয়ার দুশ্চিন্তা অমূলক। তা-ছাড়া, বিদ্যালয়ের কোনো সমর্থনের প্রয়োজনই তো ছিলনা, কারণ যখন এ-গ্রন্থ লেখা হয় তার আগেই বিদ্যালয় গুরুদেবের সার্থকতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল। এই সকল অপ্রয়োজনীয় আলোচনা যখন প্রচারলাভ করেছে, এ-গুলিকে একটু বিচার করে দেখা আবশ্যক, কারণ এই প্রকারের আলোচনায় ক্ষতি হয়।

আশ্রম-জীবন সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছু নাই এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা কিছুই লেখা হয় নাই, সুতরাং এ-বিষয়ে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। কএকটা জল্পনা অবলম্বন করায় আশ্রম অপেক্ষা বিদ্যালয় গুরুত্বলাভ করেছে, কিন্তু তাতে বিদ্যালয়েরই উপরে একটা অন্যায় ঝুঁকি থেকে গেছে। অজিতকুমার অতিরিক্ত বিদ্যালয়প্রীতির জন্যেই যে এরূপ করেছেন তা নয়। আশ্রম ও বিদ্যালয়কে এক করে দেখার শক্তি তাঁর খুবই ছিল। বস্তুত, গুরুদেবের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং তার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিণতি বিষয়ক আলোচনায় তাঁর সমকক্ষ আর কারোর কথা জানিনা।

তাঁকে ভুল খবরই দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রতিভা-শালী লেখক তিনি, তাঁকে যা বল্‌তে হয়েছে, এক-এক জায়গায় তার অনুকূলে অনেক কথা আপন বেগে লিখে গেছেন। আশ্রমের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ আবির্ভাবের কথা মহর্ষিদেব ভেবেছিলেন বলে লেখা হয়েছে সে-সব নিছক কল্পনা। মহর্ষিদেব এরূপে কল্পনার বল্গা শিথিল করে দিয়ে ভবিষ্যৎ-রচনার লোক ছিলেননা। অজিতকুমারের গ্রন্থে আছে, "আশ্রমের জন্য অত আয়োজন সকলেরি কাছে বৃথা মনে হইয়াছিল।" এ-কথা অজিতকুমারের নয়। এ কথাটি একটি অমার্জনীয় উক্তি। কারণ মহর্ষিদেবের ন্যায় মহাপুরুষের এই কাজের এরূপ সমালোচনা কটূক্তির সমান। বিদ্যালয়কে এই উক্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেন তার জোর পাওয়া আবশ্যক। পাছে লোকে ভুল বোঝে এখানেই বলে রাখতে চাই যে মহর্ষিদেবের পুত্রেরা, বিশেষতঃ গুরুদেব, প্রথম হতেই সর্বান্তঃকরণে আশ্রমের সেবা করে গেছেন। এই গ্রন্থেই দেখি, "সাধারণের মনের বিশ্বাস এই যে শ্রীযুক্ত রবিবাবুর বিদ্যালয় হওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে।" এর পরেই অজিত-কুমার আবার বিদ্যালয়কে সমর্থন করার জন্যে বলেছেন, মহর্ষিদেব "মনে মনে এই জনতার হাটই কামনা করিয়া-

ছিলেন।” যিনি আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্যে বিদ্যালয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি চেয়েছিলেন ‘জনতার হাট,’ এ হতেই পারেনা। এ উক্তির ফল হয়েছে উল্টা। যাকে ‘জনতার হাট’ বলা যায় তাকে বিদ্যালয় বলা চলেনা। আজ পর্যন্ত এ-বিদ্যালয় ‘জনতার হাট’ হয় নাই। আশ্রমের কাজ বন্ধ হওয়ায় যে-নিন্দার উদ্ভব হয়েছিল তা খণ্ডনের চেষ্টাতে মনে হয় এ-সব আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে; কিন্তু এতে অজিতকুমারের ন্যায় পুরুষের অন্তরের সায় থাকতে পারেনা বলেই ত্রুটি থেকে গেছে। আসলে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেই আশ্রম পঙ্গু হয়ে এসেছিল, সুতরাং গুরুদেবের এই কাজ তার কারণ হতেই পারেনা, এই হোলো প্রকৃত কথা। আশ্রম ব্যর্থ হওয়ার কারণ যা-ই হৌক তার নিরাকরণ গুরুদেবের হাতে ছিলনা। তিনি তখন ট্রাষ্টীদের মধ্যেও ছিলেননা। তিনি এখানে বিদ্যায়তন গড়ে না তুল্‌লে এস্থান কিসে দাঁড়াতো বলা যায়না। আশ্রম চলে, এবং বিদ্যায়তনও আশ্রমের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হয়, মহর্ষিদেব ও গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলেরই তাই কাম্য। আশ্রমের এই রূপটি অজিতকুমারের মনে সুস্পষ্টভাবেই ছিল। একাধিক ক্ষেত্রে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ হতে তাঁর এই ভাবের কথাগুলি উদ্ধৃত

করার লোভ সম্বরণ করা গেলনা। "এখানে সকল বিচিত্র সাধনার স্থান হইবে, এবং সকল সাধনার উপরে থাকিবে ব্রহ্মের সাধনা, ভূমার সাধনা। এখানে জ্ঞানী আসিবেন, বৈজ্ঞানিক আসিবেন, শিল্পী আসিবেন, কর্ম্মী আসিবেন,—ক্রমে ক্রমে হয়ত এ একটা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ের বিচিত্র সাধনা এই আশ্রমে ভূমার সাধনার অঙ্গীভূত হইবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একটা বিশ্ব-তীর্থের মতনই হইয়া উঠিবে।" মনে রাখতে হবে, এখানে কোনো প্রকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অঙ্কুরিত হবার আগেই এ-গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এই উক্তি হতে বোঝা যায় যে আশ্রমের গুরুত্ব সম্বন্ধে বোধ ও তাতে বিশ্বাস অজিতকুমারের মনে জাগ্রত ছিল, লেখনি হতে যাই বের হোক্ না। এতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি কেবল এই অজিতকুমারকেই জানি। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হোক্। বস্তুত এই ভাবের সার্থকতা ব্যতীত বিদ্যালয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের যোগ্য হয়না।

অজিতকুমার বেদী সম্বন্ধেও ভুল কথা লিখেছেন। মহর্ষি-দেবের নির্দেশ মতো আশ্রমকে নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল, সে-সব তাচ্ছিল্য লাভ করেছে।

নানা কথা শুনে যদি কারো মনে হয় যে মহর্ষিদেবের

আশ্রম কোনোদিনই মনোযোগ লাভ করে নাই, এবং সেইজন্যে তাঁর পরিকল্পনা মতো চলে নাই, তাঁকে বলে রাখি, আশ্রম কএক বছর সুচারুরূপেই চলেছিল। এ-কথাটি ভালো করে না বল্‌লে মহর্ষিদেবের প্রতি অবিচার থেকে যাবে। তবে আশ্রম বহু-বছর আশ্রমরূপে চলে নাই; প্রায় নয় বছর ভালোভাবে চলার পর অকস্মাৎ তার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন? কোথাও কারো দ্বারা এ-প্রশ্ন আলোচিত হয় নাই। এখন সে-আলোচনায় কোনো লাভ নাই। তবে এ-কথা আগেই বলে এসেছি যে গুরুদেবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সেজন্যে কিছুমাত্র দায়ী নয়। একথাও বলা আবশ্যক যে মহর্ষিদেবের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় কোনো দুর্বলতা ছিলনা, কেবল তাঁর হাতে এমন কোনো অলৌকিক শক্তি ছিলনা যে জরাগ্রস্ত অবস্থায় দূরে থেকে, এবং মৃত্যুর পরে, অন্যের উপর অব্যাহত প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পারেন।

মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি সকলেরই আদ্যন্ত বারবার পাঠ করা উচিত। যখন এ-গ্রন্থ লেখা হয় তখন বাংলাভাষা সংস্কৃতের প্রয়োগ-রূপ ও ভাব প্রকাশের নানা ঋজু ও কুটিল পথে এঁকেবেঁকে কেবল আপন পথটি ধরেছে। সেকালে, আপন অন্তঃকরণের

পরম অনুভূতিটি জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মহর্ষিদেবকে বিষম সামাজিক ও সাংসারিক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হলো। তিনি সেই-সব প্রসঙ্গ একত্র করে' তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকথা লিপিবদ্ধ করলেন যে-ভাষায় তা তাঁর নবলব্ধ প্রত্যয়ের ন্যায় সরল, এবং সেই-হেতু প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। তাতে প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যশিল্পীর বহু নিপুণতা এমন কালে, যখন বাংলা গদ্য রূপ নিলেও তার গতি স্বচ্ছন্দ হয় নাই। বহু প্রতিভাবান্ লেখকদেরও এরূপ ভাষা আয়ত্ত করতে অনেক বছর লেগেছে, এবং আজো অনেক লেখকের বই আমাদের পড়তে হয় যাঁরা এখনো তা'র কাছ দিয়েও যেতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে যে-সকল ভাব প্রকাশ পেয়েছে তারো কিছু-কিছু এ-দেশের সাহিত্যে নূতন। এর পাঠকেরা এতে দেখ্‌তে পাবেন সত্যসন্ধ স্বাধীন জীবন কাকে বলে, এবং নিষ্ঠার কি অর্থ। একটি সার্থক জীবনের রূপ এতে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের কথা যে এরূপভাবে লিখ্‌চি তা এর প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো সুযোগই ছাড়তে চাইনা বলে। যদি আমার কথায় একজনও এর প্রতি আকৃষ্ট হন তা হবে একটি বিশেষ লাভ।

এই গ্রন্থ হতে আমরা জান্‌তে পাই, মহর্ষিদেবের ধর্ম-

জীবনের আরম্ভ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যখন তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন সেইসময়ে একদিন হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে একখানি কাগজ। ঔৎসুক্যবশত তুলে নিয়ে দেখেন তাতে লেখা আছে, ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং মন্ত্রটি *। যখন এর অর্থ বুঝিয়ে নিলেন তখন দেখলেন এমনি একটি মন্ত্রের তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। আত্মজীবনী পাঠ করলে এবং তাঁর জীবন আলোচনা করলে জানা যায়, এই মন্ত্রটিকেই তিনি তাঁর ইষ্টমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তবু আনুষ্ঠানিক-ভাবে ব্রতগ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ তারিখে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের

* মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী গ্রন্থখানি হতে ঈশোপনিষদের মন্ত্রটি ও তার আংশিক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে দিলাম।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

"ঈশ্বরের দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। * * * "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—তিনি দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। এই পরমধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরমধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক।—মহর্ষিদেব।

নিকট হতে বিশজন ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে 'ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত' গ্রহণ করেন। এই কারণে ৭ই পৌষ তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট দিন।

মহর্ষিদেব এই তারিখটিকে বিশেষ গুরুত্ব আগে দেন নাই। আশ্রমের ট্রস্ট্ডীডে এর কোনো উল্লেখ নাই। অজিতকুমার এ-বিষয়ে ভুলই লিখেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে এর কথা ভেবেছেন এরূপ মনে করারও কোনো হেতু নাই; এমন কি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরে, তিন বছরের মধ্যে, মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময়েও ভাবেন নাই বলে মনে হয়; কারণ তখন আশ্রমের সঙ্গে এই দিনটির কোনো যোগ রক্ষা করার ইচ্ছা উপস্থিত হলে ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন না করিয়ে আরো কএকটা দিন অপেক্ষা করতেন ও ৭ই পৌষ সে-অনুষ্ঠান ঘটতো। মন্দির নির্ম্মাণের কাজ যখন চলছিল, এবং যখন তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অনুমান করি সেইসময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়েছে, এবং ৭ই পৌষ তারিখটিকে তিনি সেইসময়ে তাঁর আশ্রমে স্মরণীয় করে রাখার কথা ভেবে এই দিনেই মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন। তখনই আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের জন্যেও এই দিনটি নির্দিষ্ট হয়। তাঁর

প্রতি বছর ৭ই পৌষ এখানে উৎসব হয়ে আস্‌চে। এখন তা আর আশ্রমের উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হয়না, বিশ্বভারতীর দিক থেকে বিশ্বভারতীর বার্ষিক উৎসবরূপে হয়, তবে মহর্ষিদেব ও তাঁর দীক্ষা এ-দিনে কিছু-না-কিছু স্মরণ করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এই দিনের অনুষ্ঠানাদি বিশেষভাবে আশ্রমের উৎসবও তার অঙ্গরূপে পালিত হওয়া উচিত। পূর্বে দুইবেলা উপাসনা হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যার উপাসনা মেলার কোলাহলের মধ্যে আর সম্ভবপর নয়, কিন্তু দিনের বেলা মহর্ষিদেব ও তাঁর ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে এবং গুরুদেব তাঁর লেখায় ও পত্রে, অজিতকুমার তাঁর বহু উক্তিতে আশ্রম বিদ্যালয়ের যে-রূপটি এঁকেছেন সে-বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তার বিনিময়ে কোনো বাধা নাই। এই আশ্রমে এ-সবের প্রয়োজন দিনদিন অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ অনেকেই দেখি আশ্রমবিদ্যালয়ের ভাবটি ভুলে গিয়ে এখানকার বিদ্যায়তনকে সাধারণ বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে ফেলেছেন। অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যেমন, তেমনি এখানেও, নূতন বছরের কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে প্রত্যেক বার্ষিক উৎসবে এরূপ আলোচনা হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। বস্তুত এরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে কাজ সুচারুরূপে চল্‌তেই পারেনা। আশাকরি শান্তিনিকেতনের আশ্রম ও

বিশ্বভারতীর কর্তৃগণের নিকটে এ-বিষয়ে এর বেশি আর কিছু নিবেদন করার প্রয়োজন হবেনা।

১২৯৭ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ আশ্রমের মন্দিরটির ভিত্তি স্থাপিত হয়। অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে মহর্ষিদেব চেয়েছিলেন, সূর্য্যাস্তের সময়ে ছাতিমতলার বেদী হতে তিনি পশ্চিমাকাশে যেমন বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখ্‌তেন, আর এখানকার প্রান্তরে যেমন আলোককে বাধা দেবার কিছুই ছিলনা, তাঁর ব্রহ্মমন্দিরেও তেমনি রঙের খেলা থাক্‌বে এবং আলোক বাধা পাবেনা। সেইজন্যেই নানা বর্ণের কাচে সাজানো, কাচের দেওয়ালবিশিষ্ট এখানকার ব্রহ্মমন্দির। মাস দুই পূর্বে একটি প্রবন্ধে পাঠ করেছি* একটি বিদেশী কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি নির্মিত হয়, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ সিকদার কোম্পানীর ৺প্রসন্নকুমার সিকদার মহাশয়ের কৃতিত্ব স্মরণীয়। এই ভদ্রলোককে আমি স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি। তিনি কাজ দেখবার জন্যে প্রায়ই আসতেন, আমার মনে আছে। আমি বরাবরই শুনেছি, তিনিই এখানকার মন্দিরের ইঞ্জিনিয়ার। কোনো বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারকে আস্‌তে দেখি

* শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "শান্তিনিকেতনের ইতিহাস"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬।

নাই। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন যে অল্পদিন হলো তিনি ঐরূপ শুনেছেন। তখনকার দিনে পাথরের কাজ প্রায় সবই বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল। মন্দিরের মার্বেল্‌-পাথরের মেঝে ও বাইরের বালি-পাথরের পৈঠাগুলি কাদের কাজ তা আমি জানিনা।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র দার্শনিকপ্রবর ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা ৺সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেই দিনের স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল, "ওঁ তৎসৎ। ঠকুর বংশাবতংসেন পরমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার্পিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ, অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।"

মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলিকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্জন আশ্রম বহু কর্মীতে ভরে গেছে,

পাথর কাটা হচ্ছে, তা'র বিচিত্র শব্দ; তারপর রং-এর কাজ, টিন-টিন রং এসেছে, স্ত্রীলোকেরা তা শিলে বাট্‌চে, ছাঁক্‌চে, তারপর মিস্ত্রীরা লাগাচ্ছে। বহু-রং-এর কাচ কাটা হয়ে লাগানো হচ্ছে। শুন্‌লাম, কাচ কাটার কলমে হীরা আছে। হীরা তখনো দেখি নাই, কিন্তু কলমটা পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু দেখ্‌তে পেয়েছিলাম বলে মনে পড়েনা। একটা প্যাকবাক্সে নানা রং-এর কাচের টুকরা ছিল। আমি যখন বাঁধগোড়া হাই ইস্কুলে * পড়ি তখন এই টুকরা কিছু-কিছু নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে একজন হয়ে উঠেছিলাম। লাল কাচের টুকরাই অধিকাংশ বালকের প্রিয় ছিল।

মন্দিরের কাজ আর শেষ হয়না। বাদামী কাগজের ছোটো-ছোটো খাতা এলো, তার মধ্যে সোনার পাত,—একেবারে খাঁটি সোনা,—তাই মন্দিরের স্থানে-স্থানে লাগিয়ে চিত্রিত করা হলো। আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে এখনো সেই সোনার কাজ দেখা যায়।

* বোলপুরের বর্ত্তমান হাইইস্কুল্ তখন বাঁধগোড়ায় অবস্থিত ছিল। স্থান হিসাবে এখানকার তেমন গুরুত্ব ছিলনা, কিন্তু বোলপুর, সুপুর, রায়পুর ও সুরুলের মধ্যবর্ত্তী ছিল বলে এখানেই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বোলপুরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে স্থানান্তরিত হয়েছে।

নাই। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন যে অল্পদিন হলো তিনি ঐরূপ শুনেছেন। তখনকার দিনে পাথরের কাজ প্রায় সবই বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল। মন্দিরের মার্বেল্-পাথরের মেঝে ও বাইরের বালি-পাথরের পৈঠাগুলি কাদের কাজ তা আমি জানিনা।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র দার্শনিকপ্রবর ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা ৺সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেই দিনের স্টেট্স্‌ম্যান্ পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল, "ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার্পিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ, অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।"

মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলিকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্জন আশ্রম বহু কর্মীতে ভরে গেছে,

পাথর কাটা হচ্ছে, তা'র বিচিত্র শব্দ; তারপর রং-এর কাজ, টিন-টিন রং এসেছে, স্ত্রীলোকেরা তা শিলে বাট্‌চে, ছাঁক্‌চে, তারপর মিস্ত্রীরা লাগাচ্ছে। বহু-রং-এর কাচ কাটা হয়ে লাগানো হচ্ছে। শুন্‌লাম, কাচ কাটার কলমে হীরা আছে। হীরা তখনো দেখি নাই, কিন্তু কলমটা পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু দেখ্‌তে পেয়েছিলাম বলে মনে পড়েনা। একটা প্যাকবাক্সে নানা রং-এর কাচের টুকরা ছিল। আমি যখন বাঁধগোড়া হাই ইস্কুলে * পড়ি তখন এই টুকরা কিছু-কিছু নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে একজন হয়ে উঠেছিলাম। লাল কাচের টুকরাই অধিকাংশ বালকের প্রিয় ছিল।

মন্দিরের কাজ আর শেষ হয়না। বাদামী কাগজের ছোটো-ছোটো খাতা এলো, তার মধ্যে সোনার পাত,—একেবারে খাঁটি সোনা,—তাই মন্দিরের স্থানে-স্থানে লাগিয়ে চিত্রিত করা হলো। আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে এখনো সেই সোনার কাজ দেখা যায়।

---

* বোলপুরের বর্ত্তমান হাইইস্কুল্ তখন বাঁধগোড়ায় অবস্থিত ছিল। স্থান হিসাবে এখানকার তেমন গুরুত্ব ছিলনা, কিন্তু বোলপুর, সুপুর, রায়পুর ও সুরুলের মধ্যবর্ত্তী ছিল বলে এখানেই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বোলপুরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে স্থানান্তরিত হয়েছে।

তারপর পাথরের কাজ। মার্বেল্-পাথর লাগানো হলো। মিস্ত্রিরা তারপর ঘষতে আরম্ভ করলো নানা প্রকারের পাথর দিয়ে, এবং তারপরে কি একটা মশলা ছড়িয়ে মখ্‌মলে মোড়াই করা এক-একটা পিণ্ডের মতো নরম পদার্থ দিয়ে। তা'রা বলেছিল, শেষ হলে ঐ-সব পাথরে মুখ দেখা যাবে। বালক আমি, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি। সত্যিই ঐ-গুলি আয়নার মতো হয়েছিল। পরে সাদা ও কালো মার্বেল্-পাথরের ভাঙা টুক্‌রা দিয়ে আশ্রমের বাগান সাজানো হয়েছিল।

তার পরের বছর ৭ই পৌষ তারিখে মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়। পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে' মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। প্রতিষ্ঠাপত্রে ছিল, "অদ্য সর্ব্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতি ধর্ম্ম অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু,

পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তিনিকেতনে হইতে পারিবেনা। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবেনা। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা, বন্দনা ও ধ্যানধারণাদির উপযোগী হয় এবং যদ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। * * *।" এই প্রতিষ্ঠাপত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্ট্ডীডের অনুরূপ।

সেই প্রাতের উপাসনায় বেদী গ্রহণ করেন পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং অচ্যুতানন্দ স্বামী। বক্তৃতা করেন পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। দ্বিপ্রহরে অধ্যাপক বিদায় হয়, এবং সন্ধ্যাকালের উপাসনায় পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একাকী বেদী গ্রহণ করে উৎসব সমাধা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী হতে জানা যায় যে মন্দির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করার জন্যে তিনি মহর্ষিদেবের নিকট হতে আদেশ পেয়েছিলেন।

পরের বৎসরের উৎসবে, প্রাতে পূজনীয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একাকী উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যাকালে

পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি করেন। তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রগণকে অন্ন-বস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্ব্বপ্রথম আতসবাজি প্রদর্শন করা হয়, এবং পঞ্চম বার্ষিকে সর্ব্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়। কএক বছরই ভক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর যাত্রার দল নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর দল এখানে কএকবার গান করে গেছে। অনেক উৎসবেই গুরুদেব গানের ভার নিয়েছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকলে ছু'একখানা গান একলাই গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় উৎসবে কীর্ত্তন করতেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণাকুমার সেন একবার খোল বাজিয়েছিলেন।

তখন উৎসরের সময় অনেক স্থান হতে উপাসক ও দর্শক আসতেন; মহর্ষিদেবের জোড়াসাঁকোর বাড়ী হতে অনেকে আস্‌তেন; আশ্রম সরগরম হয়ে উঠ্‌তো। উৎকৃষ্ট রন্ধনকারী ও মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারীরা আস্‌তো এবং আমাদের মহোৎসবের ব্যবস্থা করতো।

মন্দিরের চূড়াটিকে আর দেখ্‌তে পাইনা। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত মহর্ষিদেবের আত্মচরিতের পরিশিষ্টে দেখি মহর্ষিদেব লিখে রেখেছিলেন,—

"দর্শনস্য দর্শনেন নো মনোহি নির্ম্মলং ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন যে 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি' অতএব আমি তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী। কিন্তু আমি তো আর চিরদিন এই সাক্ষী দিতে বাঁচিয়া থাকিবনা অতএব শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। এই লৌহনির্ম্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঁকারই আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে—

একং ব্রহ্মাস্তীতি।"

এই চূড়াটি যেখানেই থাকুক, সেটিকে যথাস্থানে সংলগ্ন করে দেওয়া নিতান্তই উচিত। মহর্ষিদেব যা-কিছু মন্দিরের চূড়ায়, প্রবেশপথে ও আশ্রমের তোরণগুলিতে লিখিয়েছিলেন, তা-ও পুনরায় পূর্ববৎ প্রদর্শিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আশ্রমের বহুস্থানে অযত্নের চিহ্ন সকলেরই দৃষ্টি পীড়িত করে। আশ্রমের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁদের মনের অবস্থা কী হয় তা অনুমেয়।

আমি তখন বালক মাত্র, কেউ আশ্রম দেখ্‌তে এলে পিতৃদেব তাঁদিকে ছাতিম তলায় নিয়ে যেতেন এবং বেদী দেখিয়ে বলতেন সেটি মহর্ষিদেবের উপাসনা-বেদী। আমিও শুনতাম। মহর্ষিদেব ওখানে বসে সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখে

উপাসনা করতেন। পিতৃদেব উপস্থিত না থাক্‌লে আগন্তুকগণকে ভৃত্যেরাই বেদী দেখাতো, আমি সঙ্গে থাক্‌তাম। এই ভৃত্যদের মধ্যে তিনচার-জন মহর্ষিদেব যখন আশ্রমে বাস করতেন তখনকার লোক ছিল। তারাও বলতো যে মহর্ষিদেব ঐ বেদীতে বসে উপাসনা করতেন। আশ্রম ছিল জনবিরল, সেখানে আমি একমাত্র বালক, কেউ এলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম, তাঁদের সঙ্গ ছাড়তামনা। সুতরাং বেদীর কথা কতবার শুনেছি যে তার ইয়ত্তা নাই।

৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী যা লিখে গেছেন এবং পিতৃদেবের ডায়ারীতেও যা পাই তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা উভয়ে পৃথক-পৃথকভাবে মহর্ষিদেবের কাছ থেকে শুনেছিলেন, তিনি যখন তাঁর উপাসনা-বেদীটি প্রস্তুত করান তখন মাটীর তলা থকে করোটি (নরমুণ্ডাস্থি) পাওয়া গিয়েছিল। কেউ-কেউ বলেছেন, এ-স্থান ডাকাতের আড্ডা ছিল। খোলা মাঠের মাঝখানে ডাকাতের আড্ডা হয়না, বনে জঙ্গলে হতে পারে। তা ছাড়া, ডাকাতেরা ডাকাতির সময়ে কাউকে খুন করলে, লাস নিয়ে এসে নিজেদের বিপন্ন করেনা। এ-মাঠে রাহাজানি হোতো, পিতৃদেব একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। করোটিগুলি রাহাজানির ফলেই এখানে প্রোথিত হয়েছিল এরূপ মনে করাও ভুল, কারণ এরূপ খোলা জায়গায় লাস

গায়েব করা যায়না। আর তাহলে শুধু করোটিই বা কেন থাক্‌বে।

এখন শান্তিনিকেতনে অনেক বৃক্ষ দেখা যায়, তাদের সংখ্যা করা যায়না। আমি যখনকার কথা বলছি তখন এ-স্থানটি ছিল একটি দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর, এবং এর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে দুটি ছাতিম গাছ, দূরে-দূরে বিক্ষিপ্ত অনুচ্চ বনখেজুরের ঝোপ, একদিকে একটি ছোটো শালবন, অন্য কোনো গাছ নাই। ছাতিম গাছ দু'টির কাছে কেবল করোটি প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কঙ্কালের অন্য কোনো অংশ পাওয়া যায় নাই। ছাতিম গাছ এ-অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়না, বস্তুত দুষ্প্রাপ্য। বীরভূম জেলায় বৈষ্ণব সাধনার জন্যে খ্যাত বহুস্থান থাক্‌লেও এ-অঞ্চল তান্ত্রিক সাধনার জন্যে বিশেষভাবে পরিচিত। আশ্রম হতে কএক মাইলের মধ্যে কঙ্কালীতলা, তান্ত্রিকদের একটি কেন্দ্র। আরো কএক মাইল দূরে লাবপুরে এইরূপ আর একটি কেন্দ্র আছে। এই সমস্ত বিবেচনা করলে মনে হয়, তান্ত্রিকেরাই ছাতিম গাছ এনেছিল এবং করোটি এনে নিজেদের পদ্ধতি-অনুযায়ী আসন রচনা করেছিল। এখানকার করোটিগুলির সঙ্গে ডাকাতি কি রাহাজানির কোনো সম্পর্ক নাই। ভাবতেও বিস্ময় লাগে যে মহর্ষিদেব

এই বীরভূম জেলার মধ্যেই এখানে, একটি তান্ত্রিকসাধনার ক্ষেত্রে, নিরাকার একব্রহ্মের সাধনা করেছিলেন, এবং অনুরূপ সাধনার জন্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

প্রথমে যে-বেদী প্রস্তুত হয়, তা ছিল চূণবালি দিয়ে ইটের তৈরি এক অনতি-উচ্চ আসনের উপর মার্বেল-পাথর বসানো। পরবর্তী সময়ে, কখন জানিনা, রঙীণ বাথ্‌টাইল্‌ দিয়ে সেই বেদীর চারি পাশ ও চত্বর সাজানো হয়েছিল। এরই আলোকচিত্র (ফোটাগ্রাফ্‌) অনেক দেখা যায়। এক সময়ে যখন বিচিত্র বর্ণের বাথ্‌টাইল্‌ আমাদের দেশে আস্‌তে থাকে, তাদের চাকচিক্যে ভুলে তখন অনেকে আপন-আপন বৈঠকখানাও ঐ গোসলখানার টাইল দিয়ে সাজিয়েছিল। কে তিনি জানিনা, মহর্ষিদেবের বেদীটিও ঐ টাইলে সাজিয়েছিলেন।

বেদীটি কখন তৈরি হয়েছিল এ-প্রশ্ন অনেকেই করেন। এটি মহর্ষিদেব করান নাই, দেখেনও নাই, এরূপ কথাও যখন চলে গেছে, তখন এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে লেখা আবশ্যক হয়েছে।

৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১২৮৬ সালে এখানে মহর্ষি-দেবের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে স্থায়িভাবে মিলিত হন। তাঁর লেখা মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট পড়ে মনে হয়,

তিনি আসার অনেক আগে, সম্ভবত যখন বাড়ী ও বাগান হয় তখনই বেদীও তৈরি হয়েছিল। তাহলে ১২৮৬ সালের অনেক আগেই হয়েছিল ধরতে হয়। এই তাঁর সাধন-বেদীটির প্রতি মহর্ষিদেবের প্রাণের টান কত গভীর ছিল তা বোঝা যায় একটি ঘটনার শাস্ত্রীমহাশয় কৃতবর্ণনা থেকে। ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ মহর্ষিদেব পরলোকগমন করেন। তার এক বছর পূর্ব্বে, ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে, তাঁর কম্পজ্বর হয়। দু'দিন পরে তিনি পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শান্তিনিকেতনে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও বলেন, "আহা! এই সময়ে যদি আমি ছাতিমতলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত।" দ্বিপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন হতে ছাতিমগাছের একটি চারা আনিয়ে দিতে; যদি সেখানে না যাওয়া হয়, ঐ চারা দেখে মনে করতে পারবেন তাঁর আশ্রমের ছাতিমতলাতেই আছেন। এই পরিশিষ্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন।

মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে শেষ আসেন ১২৯০ সালে। তার আগে দীর্ঘকাল ঐ বেদীতে বসে উপাসনা না করে থাকলে ওর প্রতি তাঁর প্রাণের টান অতো কেন হবে?

নানা-প্রকারে ঐস্থান সাজাবার নির্দেশ আসতো। তাঁরই আদেশে একটা বড়ো দোকান থেকে লোক এসে শ্বেতপাথরের উপর মন্ত্র খোদাই করা একটি ছোট তোরণ বসিয়ে যায়, আমি তখন এখানে। সে-তোরণ কিন্তু টেঁকে নাই, ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। একটি অনুচ্চ দেওয়াল গেঁথে তাতে ঐ শ্বেতপাথরের তোরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মনে পড়ে, আরো একটি সেই প্রকারের তোরণ ঐস্থানের জন্যে আসে। এখান থেকেই লেখা এক স্থানে পড়েছি যে যখন লাটসাহেব কারমাইকেল আশ্রমে আসেন তখন আম্রকুঞ্জে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং ছাতিমতলা হতে একটি শ্বেতপাথরের তোরণ তুলে এনে সেখানে লাগানো হয়। এই মঞ্চ 'কারমাইকেল্ বেদী' নামে পরিচিত হয়েছিল। অবশ্য কর্তৃগণ এই নামকরণ করেন নাই। এর এইটুকুই ভালো যে তোরণটি আর সেখানে নাই।

আগেই বলেছি, বেদীটিকে আর দেখিনা। এই বেদীটির সঙ্গে আমার জীবনের একটি পরম শুভ মুহূর্ত্ত বিজড়িত থাকায় প্রায়ই এর কথা মনে পড়ে, এবং কখনো-কখনো মন বিশ্বাসই করতে চায়না যে সেটি আর নাই। কখনো-কখনো বোধ হয়, এখানে যে উচু করে নূতন মাটি দেওয়া হয়েছে তা তফাৎ করে দিলেই বেদীটি বুঝি

দেখ্‌তে পাবো। এ-বেদী এখান থেকে সরিয়ে ফেলার অধিকার আশ্রমের ট্রাস্টীদেরও নাই। যেখানেই থাক্ বেদীটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং স্থানটিকে যথাসম্ভব পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে ওখানে প্রস্তর ফলকে লিখে রাখা উচিত যে স্থানটি মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র এবং বেদীটি তাঁরই ব্যবহৃত বেদী। যেহেতু স্থানটি এখনো মহর্ষিদেবের উত্তরবর্ত্তিগণের হাতেই আছে, আশাকরি যে-ভুল হয়ে গেছে তা'র যথাবিহিত সংশোধন হতে বিলম্ব হবেনা।

এখন যে-বাড়ীটি শান্তিনিকেতনের অতিথিশালা নামে পরিচিত, তা যাঁরা সাধনভজনের উদ্দেশ্যে এখানে আস্‌বেন, তাঁদের বাসের জন্যে ও ট্রাস্ট্‌ডীড্-অনুযায়ী উপাসনার জন্যে মহর্ষিদেব দান করে গেছেন। মন্দির তখনো প্রস্তুত হয় নাই। একেশ্বরবাদীদের সাধনভজনের জন্যে কোনো আশ্রম ছিলনা, তিনি এই অভাব দূর করে দেন। অন্য কারো' এখানে অধিকার নাই। এখন এ-বাড়ী বিশ্বভারতীর অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং প্রায় সকল ব্যক্তিই এখানে থাক্‌তে পারেন। এই গৃহে মহর্ষিদেব বাস করেছিলেন। এখানে নিয়মিত উপাসনা হতো। এখন এ-বাড়ীর সঙ্গে ধর্মচর্চার কোনো সম্বন্ধ দেখা যায়না। ট্রাস্টীরা কেন যে এরূপ হতে দিয়েছেন তা বোঝা যায়না

কেবল মহর্ষিদেবের উদ্দেশ্যের অনুরূপ কার্যের জন্যে এ-বাড়ী ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

পিতৃদেবের লেখা হতে জানতে পারি যে ধনী পিতামাতা কন্যাকে প্রথম স্বামীগৃহে পাঠাবার সময় যেমন তা'র ঘরকন্না দ্রব্যসম্ভারে সাজিয়ে দেন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সময়ে মহর্ষিদেব আশ্রমবাটী তেমনিভাবে নানা দ্রব্যে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এমন কি সূচসূতাটিও বাদ যায় নাই। আমি দেখেছি সকল ঘরে মাদুর বিছানো, সর্বদা পরিষ্কার তক্‌তকে করে রাখা। ফরাস ছিল আশ্রমের চৌকিদার দ্বারিক সর্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুচাঁদ। ছয়টি পালঙ্ক ছিল। আরো একটি মেহগনি-কাঠের বৃহদাকার পালঙ্ক ছিল, শুনেছি মহর্ষিদেব যখন এখানে থাকতেন তখন সেটি ব্যবহার করতেন। অতিথিদের জন্যে তিনখানি পালঙ্কে শয্যা সর্বদাই প্রস্তুত থাক্‌তো। উপরের বড় ঘরে জাজিম বিছিয়ে তাতে অনেকগুলি তাকিয়া রাখা হতো, আর চারিদিকে সাজানো থাক্‌তো গদি-আঁটা চেয়ার কৌচ প্রভৃতি। নিচের তলায় পূর্বদিকের ঘরে আশ্রমের কার্যালয় ও গ্রন্থালয় * ছিল।

* এই সূত্রে মনে পড়ে গেল, এক জায়গায়—এখান থেকেই লেখা—পড়েছি যে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থালয় আদি ব্রহ্মসমাজের গ্রন্থলয়ের ধ্বংসাবশেষ। এ-কথা ভুল। যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো আদি ব্রাহ্মসমাজের জমজমাট্ চলচে—ভাঙন ধরে নাই। মহর্ষিদেব কী-ভাবে আশ্রম সাজিয়ে দেন তা পিতৃদেবের

নীচের বড় ঘরে আমরা পড়াশোনা করতাম। এখানেই সাপ্তাহিক উপাসনাও হতো। বাকী ঘর কয়টিতে আমরা থাকতাম। সিড়ির ঘরের খিলানের তলায় স্রুচাঁদের আলোবাতি তৈরি করার জায়গা ছিল। অনেক লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, সেজ, বাতি প্রভৃতি ছিল। মন্দির হবার পরে কএকটা বেলোয়ারী কাচের ঝাড় এলো, এখনো তার কিছু-কিছু আছে। ঐখানেই একটা অতি পুরাতন অব্যবহার্য গাদা বন্দুক ও একখানা মরচে-ধরা তলোয়ারও ছিল। চেয়ার টেবিল যে কত ছিল তার এখন সংখ্যা দিতে পারিনা। বাসনপত্র ছিল অনেক। শ্বেতপাথরের থালা বাটী গেলাশ, তাও ছিল। একটা বহু দেরাজবিশিষ্ট সিন্দুকে নানা দ্রব্য সাজানো থাকতো। তার মধ্যে ছিল অনেকগুলি সাধারণ ঔষধপত্র, থার্মোমিটার, একটা কাঠের তৈরি বুক পরীক্ষার যন্ত্র, মাথা ধরলে কপালে ঘষবার জন্যে একটি সুন্দর কাঠের কৌটায় পিণ্ডের আকারে মেন্থল্ ইত্যাদি। এই শেষের বস্তুটা ব্যবহার করার জন্যে মাঝে-মাঝে স্রুচাঁদের খোসামুদি করতাম।

বিবরণে আছে। তিনি তাঁর নিজের ব্যবহৃত সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলা পুস্তক এখানে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থালয় যখন উঠিয়ে দেওয়া হয় তখন সেখানকার কতকগুলি পুস্তক এখানকার বিদ্যালয়ে আনা হয়েছিল। তার আগেই, আশ্রমের গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের গ্রন্থভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে।

পুরাতন রান্নাঘর ভেঙে যাওয়ায় সেখানে একটা নূতন বাড়ী তৈরি করানো হয়েছে। রান্নাঘরের ব্যবস্থা, তৈজসপত্র ছিল উচ্চ শ্রেণীর। ভিতরের দিকে অনেক ঘর ছিল, সেগুলি উৎসবের সময়ে ভাঁড়ার, ভিয়ান, অতিরিক্ত রান্নাঘর প্রভৃতির জন্যে ব্যবহৃত হোতো।

মালি ছিল হরিষ মালি, হরি মালি ; তারা সারা বাগান পরিষ্কার রাখতো, মেহেদির বেড়া মাঝে-মাঝে ছাঁটা হতো। বৃহদাকার কাঁচিগুলি আমার বিস্ময়ের বিষয় ছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তার চারিদিকে রেলিং লাগানো হয়। পাথরের সিঁড়ি ও রেলিং-এর মধ্যে যে পাকা অংশ মন্দিরের চারিধার বেষ্টন করে আছে তা তৈরি হয়েছিল তার উপর প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড টবে পাম গাছ সাজিয়ে রাখার জন্যে। এখানকার রোদে গাছগুলি হল্‌দে হয়ে যাওয়ায় পামের জায়গায় গোলাপ গাছ লাগানো হয়। এ-গুলি অনেক বছর ছিল। আমরা আশ্রম ত্যাগ করার পরেও ছিল। মহর্ষিদেব তাঁর আশ্রম ও মন্দিরের কথা কখনো ভুলতেননা বলে মনে হয়। নিজে আস্‌তে পারতেন না, মনে-মনে চিন্তা করে কেমনভাবে এ-স্থানটি সাজানো হবে তার নির্দ্দেশ দিতেন। আমরা এখান থেকে যাওয়ার পরেও আমি অনেক দিন বোলপুরে থেকে বাঁধগোড়া ইস্কুলে

পড়তাম। এ-স্থানের প্রতি আমার প্রাণের টান এতো ছিল যে ইস্কুলের ছুটির পরে খেলা ফেলে কতো দিন বিষণ্ণ-মনে একলা-একলা এখানে ঘুরে গেছি। প্রত্যেক গাছটি ছিল আমার পরিচিত, তাদের অনেকগুলিই এখন নাই। এখানে আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম, তবুও আমার শৈশব ও বালক বয়সের এই বাসস্থান ছেড়ে কোথাও শান্তি পেতামনা। পরেও এসেছি যখন আমার এক শিক্ষাগুরু, ৺নগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় এখানে অধ্যাপনা করতে আসেন। তারপর কলেজের শিক্ষা শেষ করে এখানেই কাজ করতে আসি। শেষ বয়সে অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবার জন্যে এসেছি।

বাঁধগোড়া ইস্কুলে পড়বার-কালে একবার এসে দেখলাম যে মন্দিরের সম্মুখে গর্ত করে সুন্দররূপে বাঁধিয়ে একটি ফোয়ারা বসানো হয়েছে। কাঁঠাল গাছের পাশে পাম্প্ বসিয়ে উপরের আধারে জল তোলা হতো ফোয়ারার জন্যে। আমি নিজে অনেকবার পাম্পের চাকা ঘুরিয়ে ফোয়ারা চালিয়েছি। পরে এ-স্থানটি আরো সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ইটের তৈরি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়ে সে-গুলির উপর গাছের টব রাখা হয়েছিল, এবং মঞ্চগুলির চারিধারে নানা মন্ত্র লেখানো হয়েছিল। এ-স্থানটি সুন্দর করে রাখা হয়, এখানে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা চলে এবং

বার্ষিক উৎসব যথাযোগ্য আয়োজনের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয় এই ছিল মহর্ষিদেবের ইচ্ছা।

প্রথমেই বোলপুরের প্রার্থনা-সমাজের কথা বলে এসেছি। পুরাতন তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি এই সহরে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে আমার নামকরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান হয়তো এখানকার প্রার্থনা-সমাজের সভ্যদের প্রথম ও শেষ পারিবারিক অনুষ্ঠান। এর পর আর এই সমাজ রাখারই প্রয়োজন ছিলনা, কারণ তার সভ্যেরা যা চেয়েছিলেন, তাই পেলেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো। মহর্ষিদেবের ট্রাস্ট্ডীডে একটি নূতনতর কথা এই আছে যে গৃহের বাইরে উপাসনা করার জন্যে কারো' অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হবেনা, কেবল গৃহের 'অভ্যন্তরে' উপাসনার জন্যে ট্রাস্টীদের অনুমতি আবশ্যক। বোলপুরের ব্রাহ্মেরা, যাঁরা আপনা হতেই এই স্থানটিকে সমবেত উপাসনার ক্ষেত্র করেছিলেন তাঁরা, বাইরেই উপাসনা করতেন। ট্রাস্ট্ডীডে মহর্ষিদেব তাঁদের প্রতি এই সম্মান দেখিয়েছিলেন যে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরেও তাঁদিকে কারো' মুখাপেক্ষী হতে হবে না। *

* এই কথা লিখ্তে-লিখ্তে মনে পড়ছে যে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা মাঘোৎসবের প্রাতে সকলকে নিয়ে উপাসনা করার উদ্দেশ্যে মন্দির চেয়ে যখন পান নাই তখন বাইরে আমলকী-তলায় উপাসনার ব্যবস্থা হতে পারতো, কিন্তু বিষয়টি বড়োই কটু হয়ে পড়তো, বিশেষত মাঘোৎসবের দিনে, সেইজন্যে তা করা হয় নাই।

এরপর তাঁদের বাইরে উপাসনা করার প্রয়োজনও হয় নাই, কারণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রথম হতেই পিতৃদেবের হাতে আশ্রম দেখাশোনা করার ভার পড়ে, আর তারপরে তিনিই আশ্রমধারীর পদ গ্রহণ করে' এখানে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। তার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার আরম্ভ স্বরূপে যে উপাসনা হয় তাতে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে পিতৃদেব আচার্যের কাজ করেন্ ও ৺অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় সঙ্গীত করেন।

বোলপুর হতে পিতৃদেবের যে-সকল বন্ধুরা এখানে সাপ্তাহিক উপাসনার জন্যে আস্‌তেন তাঁদের অনেককেই আমার মনে আছে, তবে বিশেষ করে নাম করতে চাই বাঁধগোড়া হাই-ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ৺নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের, কারণ তিনি প্রায়ই আস্‌তেন এবং রাত্রিকালেও মাঝে-মাঝে আশ্রমে থাক্‌তেন। ইনিই ছিলেন গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অগ্রণী। তখন তিনি সেখান-কার হাই-ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। বোলপুরেও পিতৃদেবের কাজে তিনিই প্রধান সহায় ছিলেন।

আশ্রম যখন মহর্ষিদেবের নির্দেশ মতো একেশ্বরবাদি-গণের সাধন-আশ্রমরূপে চল্‌ছিল সে-সময়ের বিষয়ে অনেক কথাই মনে আছে। আগেই বলেছি পিতৃদেব এ-বিষয়ে

লিখ্‌বার সময় পান নাই। একতলার বড় ঘরে জাজিম বিছিয়ে উপাসনা হতো। আমি আমার মাতৃদেবীর পাশে বসে উপাসনায় যোগ দিতাম মনে আছে। পিতৃদেবই উপাসনা করতেন, তাঁর ডায়ারি থেকেও তা জান্‌তে পাই। প্রায়ই বাইরের সাধকেরা কেউ-না-কেউ আস্‌তেন, আর এরূপ কেউ এলে তিনিই উপাসনা করতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই আস্‌তেন স্মরণ হয়। আশ্রমে একখানি বৃহদাকার বাইবেল গ্রন্থ ছিল, তিনি সেখানি সম্মুখে নিয়ে উপাসনায় বস্‌তেন। এই গ্রন্থখানি এখনো আছে। শেষবার যখন দেখেছি এখানি যত্নে রক্ষিত হচ্ছিল বলে মনে হয় নাই। আর যাঁরা আস্‌তেন বলে জানা গেছে, এবং আমি স্মরণ করতে পারি তাঁদের নাম—হেমচন্দ্র ভট্ট, রামকুমার বিদ্যারত্ন, ব্রজগোপাল নিয়োগী (ইনি পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন), ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ঈশানচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ বসু, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, প্রকাশ দেবজী, ভাই সুন্দর সিংজী, জোড়াসাঁকোর বাড়ী হতে যাঁরা আসতেন তাঁদের কারো' কারো' উদ্দেশ্য ছিল নির্জ্জনে সাধনা।

বড়বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ কএকবার এসেছিলেন, গুরুদেবকে অনেকবার এখানে দেখেছি। পিতৃদেবের ডায়ারীতে পাই, গুরুদেব তাঁর সঙ্গে বসে এখানে উপাসনা করতেন। এ-ছাড়া, আরো অনেকে আস্‌তেন, এখন সকলের নাম মনে নাই। অনেকের সঙ্গে থাক্‌তো একতারা, বাজিয়ে গান করতেন। একজন একটি বাঁওয়া আন্‌তেন, তাই বাজিয়ে তাঁর গান হতো। দয়ানন্দচরিত-প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায়ই দেখতাম। পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ও এখানে কিছুদিন ফিরে-ফিরে আস্‌তেন। এ-ছাড়া, বোলপুরের উপাসকেরা তো আস্‌তেনই। অনেকে মনে করেন কেবল উৎসবের সময়েই এখানে কিছু হতো, অন্য সময়ে স্থানটি এমনিই পড়ে থাক্‌তো। একথা ঠিক নয়। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা এখানে নিয়মিত হতো। তাছাড়া, বিশেষভাবে সাধনভজনের জন্যে অতিথি-সমাগম সারা বছর চল্‌তো।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মহর্ষিদেব ইচ্ছা করেন যেন সেখানে প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের 'ব্রহ্মোপাসনা' অংশটি নির্ভুল উচ্চারণের সঙ্গে পঠিত হয়, এবং এ-জন্যে অচ্যুতানন্দ স্বামী নামে একজন উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি পণ্ডিতজী নামে পরিচিত

ছিলেন। তাঁর ভাষা এবং তাঁর ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভালো বুঝতামনা, কিন্তু তাঁর মন্ত্রপাঠ ভালো লাগ্‌তো। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিনা। ব্রাহ্মণ স্বপাক খেতেন। ইনি পরে আশ্রমধারী হন। এঁর মৃত্যুর পরে এঁরই পুত্র মন্দিরে মন্ত্রপাঠ করার জন্যে নিযুক্ত ছিলেন। অচ্যুতানন্দ স্বামী আসার পর তিনি দু'বেলা মন্দিরে মন্ত্রপাঠ করতেন। কেবল রবিবারের বৈকালে বোলপুরের উপাসকেরা সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতে আস্‌তেন, তখন পিতৃদেব পণ্ডিতজীর সঙ্গে বেদী গ্রহণ করতেন।

অতিথিদের অনেকের কাছ থেকেই বহু স্নেহ লাভ করেছি। সুন্দর সিংজী বাংলা দেশে এসে বাংলা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ পড়তে দেখে আমার খুব আমোদ বোধ হয়েছিল।

বাইরের উপাসকেরা এলে আশ্রমে সঙ্গীত, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি প্রায় সমস্তক্ষণই চল্‌তো। এখানকার আবহাওয়া এমনি ছিল যে আমি বালককালেই অনুভব করেছি এ-স্থান বোলপুর কিম্বা আমাদের গ্রামের ন্যায় নয়, এ ধর্মকর্মের স্থান। একবার অগ্নিহোত্রী শিবনারায়ণ পরমহংস মহাশয় কিছুদিন আশ্রমে ছিলেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তো প্রায়ই আস্‌তেন। তাঁর আলখাল্লার

মতো দীর্ঘ গেরুয়া রঙের জামা, গেরুয়া পাগড়ী এবং তাঁর ছোটো বাঁটের হাল্কা ছাতাটি এখনো আমার মনে আছে। ১৪।১৫ বছর পরেও এরূপ ছাতা তাঁর হাতে দেখেছি।

এ-স্থানটিকে মহর্ষিদেব সৎকর্মের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন, এবং তাঁর ধর্মজীবনের সাক্ষীরূপে গড়ে তুলেছিলেন। ১৩০৩ সালে এ-অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন এখানে প্রতিদিন কএকজন লোককে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাসে-মাসে কএকখানা কাপড়ও দান করা হতো। আশ্চর্য, কে এই সকল লোককে কী বলেছিল জানিনা, এই ব্রাহ্মপ্রতিষ্ঠানে দুর্ভিক্ষের সময়েও অনেকে আমাদের হিতলাল ঠাকুরের রাঁধা ভাত খেতে চায় নাই।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের কথা লিখছি, আর বিদ্যালয়ের কথা ফিরে-ফিরে মনে আস্‌ছে। তার কারণ, আজ বিদ্যালয়ের পরিচয় সর্বত্রই আছে, যে-দিকেই তাকাই না কেন। এর বহুধা বৃদ্ধিলাভ সকলেরই বিস্ময়ের বিষয়। আশ্রমের ভাব ও আদর্শ তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে উঠুক, তাহলে আশ্রম ও বিদ্যায়তন নিরন্তর হয়ে কেবল আনন্দময় নয়, পরিপূর্ণ কল্যাণময় হয়ে উঠবে। পৃথক-পৃথক ভাবে তাদের মধ্যে যে অভাব ও সমস্যা দুশ্চিন্তার কারণ হয়, মিলিতরূপে সে-সবের স্থান নাই। বিষয়টি সাধন-সাপেক্ষ তা জানি,

কিন্তু বিদ্যার কেন্দ্র সেরূপ সাধনার কেন্দ্র হতে না পারলে সে বড়ো পরিতাপের বিষয়। সাধারণত বিদ্যালয় হতে যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ হয়না তা কেবল প্রকৃত সাধনার অভাবে। আশ্রমকে পাশ-কাটিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে, কারণ অর্থচিন্তা তখন চরম হয়ে ওঠে, তখন আর অন্যদিকে মন যায়না। এতোদিন ধরে শান্তিবাদিগণ শান্তিনিকেতনে সভা করলেন, তাঁদিকে দেখাবার মতো আশ্রম নাই, সুতরাং তার কথা বলা গেলো না।

দেশের অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকারের প্রসঙ্গ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেবার লোক আজকাল হয়েছে। যা হাতে ধরা যায়না, অঙ্গুলিসংকেতে দেখানো চলেনা, অনেকের কাছে তার মূল্য নাই। বিস্তৃতক্ষেত্রে সুদীর্ঘ কর্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা হতে বুঝেছি, কেবল বাইরের সুবিধালাভই যার উদ্দেশ্য, কখনো-কখনো মনে হতে পারে তা হতে কিছু বুঝি পাওয়া গেছে, কিন্তু তাতে গভীর ও স্থায়ী কোনো সফলতা আসেনা, নিষ্ফল হতেই হয়। অন্য ক্ষেত্র অপেক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টি লাভ করা তেমন কঠিন নয়, যদি কেউ সত্যিই দেখতে চান, কারণ নূতন-নূতন জীবন যেখানে রূপ নিচ্ছে, সেখানে এখানো তেমন জটিলতা আসে নাই। তবু এতেও সময় লাগে। কেবল ভুলের ভিতর

দিয়ে শেখা, তাতে যে বিষম ক্ষতি। সেইজন্তেই তো সত্যের দিক থেকে দেখানো ও দেখবার শিক্ষাই, আশ্রমের শিক্ষা। এর পদ্ধতিও আমাদিকে শেখানো হয়েছে। আমরা যে প্রতিদিন "ওঁ পিতা নোঽসি" বলে প্রণাম করে কাজে হাত দিই, এই প্রণাম সকল কাজে চলবে, কাজ হবে এমনি। এই হলো এখানকার শিক্ষা। এ-তো চোখে দেখার ব্যাপার নয়, এই প্রণামকে কাজের সঙ্গে গেঁথে তুল্‌তে হয় অনুকূল আশ্রমজীবনের মধ্যে। এর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের এবং অধ্যাপকের ; অধ্যেতা তাঁদের পদানুসরণ করে।

বহু বিদ্যালয় দেখে এসেছি। কএক শত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্বন্ধে পৃথক-পৃথকভাবে বছরের পর বছর খবর রাখতে হয়েছে। তাদের অনেকগুলিতে আয়োজনের অভাব ছিলনা, কর্মীরা যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন। সেগুলি পেয়েছিল সুবিশাল অট্টালিকা, কতো লোকজন, তাদের কতো উর্দি, কতো তক্‌মা। কিন্তু হায়, তারা তো সমৃদ্ধ হতে পারে নাই। অধিকাংশক্ষেত্রেই ছিল গভীর নিষ্ঠার বিষয়েরই অভাব, তেমন নিষ্ঠা তো পরের কথা। সে-গুলি চলেছে পরীক্ষায় ছাত্রকে 'পাশ' করিয়ে দিয়ে, এবং তাতেই আপনাদিকে সার্থক মনে করেছে। তার আগে কতো ছাত্রকে যে ছেঁটেছে, ফেলে এসেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

'পাশের' হিসাব দিয়েছে বড়ো-বড়ো অঙ্কে, কিন্তু সমাজ-অঙ্গে এতো ক্ষতি আর কোথাও হয় নাই। আমাদের এই একটি বিদ্যালয়কে জানি, গুরুদেব যার উদ্দেশ্যকে করেছিলেন অপরিমেয়, এবং এইজন্যে তাঁর পিতৃদেবের আশ্রমে, অনন্ত-স্বরূপের সাধনার আশ্রয়ে, তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এখানে নিষ্ঠার বিষয়বস্তুর অভাব নাই। আশ্চর্য কুশল-কর্মা ছিলেন তিনি—তাঁর বিদ্যালয়ে না-ছিল বন্ধন, না-ছিল কোথাও ফাঁক। চিত্তকে দিয়েছিলেন ছাড়া, সে বিকশিত হবে বলে; আশ্রমধর্মে তা'র যোগসাধন করেছিলেন কল্যাণের সঙ্গে। আজ বসে বসে তাই ভাবি।

আমাদের এই সংস্কৃতিসমৃদ্ধ আশ্চর্য দেশে অগণন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেকের প্রতিষ্ঠাতারা এরূপ ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যে সুচারুরূপে সেগুলি পরিচালিত হতে পারে। এ-দেশে বহু সাধনক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে, একদিন তাদের পুণ্যপ্রভাব আলোকরশ্মির ন্যায় দিকে-দিকে প্রসারিত হয়ে বহু কল্যাণ বিতরণ করেছিল। তারই স্মৃতিতে মণ্ডিত হয়ে স্থানগুলি তীর্থ হয়েছে, এখনো লোকে সেইসকল পুণ্যভূমিতে পবিত্রতার স্পর্শ লাভ করে। ইতিহাস তাদের নাম রক্ষা করেছে, কিংবদন্তি ধরে রেখেছে তাদের পুরাতন দিনগুলির পরিচয় গীতে, গল্পে, কখনো বা কথায়। শতাব্দীর

পর শতাব্দী বহে গেছে, মুছে নিয়ে গেছে কতো ধূলো, উড়িয়ে নিয়েছে কত আবর্জ্জনা, আর সেই সঙ্গে মানুষের অবহেলার কারণে আমাদের সৌভাগ্যের বহু হিরন্ময় প্রতীকও লোপ পেয়েছে। কতো স্থানে মানুষের শত সাবধানতা মানুষেরই আঘাত থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে পারে নাই। হয় তো বাহির দাঁড়িয়ে আছে তা'র পুরাতন গৌরবে, ভিতর হয়েছে রিক্ত, কোথাও বা সমস্তই গিয়েছে বিস্মৃতির গহ্বরে। কখনো কালের প্রভাবে তা ঘটেছে, কখনো বা অল্পদিনেই—কোন্ দুর্ব্বলতার জন্যে সব সময়ে তা ধরাও যায়না। তবু যেখানে সত্য যতটুকু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা-তো লোপ পাবার নয়। মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতের সোপান কালকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। ফেনিল আড়ম্বর বহুস্থানে সঙ্কুচিত হয়ে সাধারণ দৃষ্টিতে এসে পড়েছে শেষের পর্যায়ে, কিন্তু প্রথম উচ্ছ্বাসের বাহুল্যের অন্তস্থলে যে-সাধনা ছিল তা যাবাব নয়। তা কি সকলের কাছেই অগোচর থেকে যাবে? বাহ্য প্রকাশের দৈন্য ভেদ করে কেউ তাকাবেনা ভিতরে?

আজ্ এই কথা বারবার মনে হয়, এতোদিন যে আমরা বিশ্বাস করে এসেছি মহর্ষিদেব এই আশ্রমে তাঁর সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, কিছু যেন আমাদের সে-বিশ্বাস টলাতে না পারে, এবং একে কেবল কথার-কথা করে না

রাখি। তাঁর জীবনব্যাপী অত্যাশ্চর্য সাধনার কথা যেন আমরা মুহূর্ত্তের জন্যেও না ভুলি। বিশ্রুতির জন্যে লালায়িত হয়ে, অথবা আমাদের অন্তরের দৈন্য ঢাকতে গিয়ে, যদি বাইরের আড়ম্বরকে বাড়িয়ে তুলি, এবং দৃষ্টি যদি যা আপাত-মাত্র তাতেই নিবদ্ধ হয়ে যায়, তবু ভুলবোনা যে এই আশ্রম এবং এর বিদ্যায়তন গতানুগতিক মাত্র নয়। তবেই আমরা রক্ষা পেতে পারবো।

আমাদের মহর্ষিদেবের বীর হৃদয়কে স্বার্থচিন্তা, সাংসারিকতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিম্বা প্রসিদ্ধির লোভ, অথবা কুলগর্ব্ব কি কুলপ্রথা কিছুতেই দমন করতে পারে নাই। সত্যপথে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। নির্ভীক পদক্ষেপে, অমৃতমন্ত্রে তাঁর অনুবর্তিগণকে অভয় দান করে'। সেই তাঁর অভয়বাণী আমরা শুনেছি এই আশ্রমে তাঁরই আত্মজ ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠে, ভারতের বাণীরূপে। সমগ্র জগৎ তা শুনে বিস্মিত হয়েছে। এ-আশ্রম কোনোদিন ধার করা কথা বলে নাই, তা'র পাত্র ভিক্ষাপাত্র নয়, তা চিরকালই পূর্ণ অক্ষয় সম্পদে। এই কথা স্মরণ করে আমার নিবন্ধ শেষ করতে চাই এই প্রার্থনায় যে শুধু বাইরে নয়, শুধু বাক্যে নয়, সর্ব্বাঙ্গীন চরিতার্থতায় এই আশ্রম ও তার বিদ্যায়তনে ধ্বনিত হতে থাক্, সকল কর্ম্ম সকল চেষ্টার মধ্যে দিয়ে, সকল কণ্ঠে সেই মন্ত্র, মহর্ষিদেবের জীবন যা'র সাক্ষী—

একং ব্রহ্মাস্তীতি।